মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ

মুহাম্মদ মুস্তফা

(সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

হোক সে শাসন সব হৃদয়ে শরীয়তের, খোদা করে।
পুণ্য লভুক মুস্তফারই আনুগত্যের, খোদা করে।।
– কালামে মাহ্‌মুদ।

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ
খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)

ভাষান্তর ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

প্রকাশকাল ঃ

১২ রবিউল আউয়াল	ঃ	১৪১৮ হিঃ
১৮ জুলাই	ঃ	১৯৯৭ খ্রীঃ
৩ শ্রাবণ	ঃ	১৪০৪ বাং

প্রচ্ছদ ঃ প্রফেসর মীর মুবাশ্বের আলী

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তা'লা কোরআন করীমে হযরত **খাতামুন্নবীঈন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্** সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

'নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপরে অধিষ্ঠিত' – ৬৮ঃ৫।

এবং তিনি মানবজাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ'– ৩৩ঃ২২।

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি আল্লাহো আনহা বলেছেন ঃ

'তাঁর (মুহাম্মদ - সাঃ) চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কোরআন' – (বুখারী ঃ আবু দাউদ)।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর একটি ইল্‌হামে বলা হয়েছে ঃ

'সকল আশিস ও কল্যাণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকেই।'

– (তায্‌কেরা, পৃঃ ৪৫)।

তাঁর (আঃ) আর একটি 'ইলহাম' হলো ঃ –

'আহমদ (সাঃ)-এর মহিমা চিন্তা ও কল্পনারও ঊর্ধ্বে ;

তাঁর 'গোলাম'–কেই দেখো ! সে যামানার মসীহ্ হয়েছে।'

(দ্রঃ রসূলে আযম ঃ মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর জ্যোতির্ময় গৌরব ও মহিমা ঃ পৃঃ ১০৪)

আমরা এই সত্য জানি এবং নিঃসংশয়ে ঘোষণা করি যে, একমাত্র আমাদের নেতা ও প্রভু মুহাম্মদ (সাঃ)-ই মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ এবং ত্রাণকর্তা এবং দীদারে ইলাহীর দর্পণ।

অধুনা, সত্যানুসন্ধানী অমুসলিম চিন্তাবিদরাও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামগ্রিক শ্রেষ্ঠত্বকে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করছেন। যেমন, ল্যামরটাইন (Lamartine) বলেছেন ঃ

'সকল প্রকার মানদন্ডে, যদ্বারা মানবীয় মহত্ব পরিমাপ করা যায়, আমরা এই প্রশ্ন করতে পারি যে, আছেন কি এমন কেউ যিনি তাঁর (মুহাম্মদ - সাঃ) চাইতে শ্রেষ্ঠতর ?'

[History of Turkey : p. 276 ; দ্র ঃ (Sir) Muhammad Zafrullah Khan : 'Muhammad : Seal of the Prophets' : p. 3.]

সুধী পাঠক !

আমাদের এই পুস্তকখানি ঃ **'মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ ঃ মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)'** আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) কর্তৃক প্রণীত তফ্‌সীরে কবীর'-এর ভূমিকার একটি অংশ বিশেষ। কোরআন করীমের ঐ ভাষ্যের আয়তন বিশাল। এর ভূমিকা পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার। এই ভূমিকার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর একটি নাতি-বিস্তারিত জীবনীও অন্তর্ভুক্ত। এই পবিত্র জীবনীর বঙ্গানুবাদ আমরা ইতোপূর্বে আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে প্রকাশ করেছি। সেই গ্রন্থটির নাম ঃ **নবীনেতা ঃ মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম।'** এক্ষণে আমরা এই জীবনীর সিরাত (চারিত্র্যের আলোচনামূলক) অংশটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করছি। এই অংশটি মূল জীবনীর চাইতে অনেক ছোট। কিন্তু, অনুসৃত হওয়ার গুরুত্বের দিক থেকে, সম্ভবতঃ বড়। কেননা, পূর্ণ ও পবিত্র ও প্রিয়তম চারিত্র্যই সেই সর্বোত্তম আদর্শ।

হযরত **রহমতুল্লিল আ'লামীন** (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও তিরোভাবের এই আশিস-মন্ডিত মাসে তাঁর (সাঃ) মহোত্তম পুণ্যময় 'সিরাত'-এর এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকখানি আমাদের মাতৃভাষাভাষী মানুষের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। এবং আমরা চির - কৃতজ্ঞ আমাদের খোদার প্রতি। প্রার্থনা করি, তিনি কৃপা করে আজকের জগদ্বাসীকে তাঁর সেই **সিরাজুম মুনীরা**'র ঐশী আলোতে 'সরল-সুদৃঢ় পথে' এগিয়ে চলার সদিচ্ছা ও শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন ! আমীন।

জনাব মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান এবং জনাব আব্দুল্লাহ্‌ ইউসুফ মোহাম্মদ পুস্তকটির প্রুফ দেখেছেন। কোন ভুল-ভ্রান্তি গোচরীভূত হলে, তা আগামীতে সংশোধন করা যাবে, ইনশাআল্লাহ্‌। এই প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আল্লাহ্‌তা'লা আপন কৃপায় ও পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

আমাদের শেষ কথা ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য।

খাক্‌সার

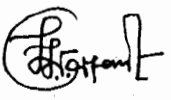

(আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী)
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ঢাকা
রবিউল আউয়াল ১২, ১৪১৮ হিঃ
(জুলাই ১৮, ১৯৯৭ খ্রীঃ)

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১।	সূচনা	১
২।	আঁ হযরত (সাঃ)-এর প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) পবিত্রতা	২
৩।	খানা-পিনায় সরলতা ও তাক্ওয়া (খোদাভীরুতা)	৩
৪।	পোষাক ও গহনা-পাতির ক্ষেত্রে সরলতা ও খোদাভীরুতা	৬
৫।	বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে সরলতা	৮
৬।	বাড়ী ও বসবাসের ক্ষেত্রে সরলতা	৮
৭।	খোদাতা'লার সঙ্গে মহব্বত এবং এবাদত	৮
৮।	খোদাতা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা	১২
৯।	নিজ বিবিগণের (রাঃ) প্রতি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আচরণ	১৭
১০।	উত্তম চারিত্র্য	১৮
১১।	সহিষ্ণুতা	১৯
১২।	ইনসাফ বা সুবিচার	২১
১৩।	আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা	২২
১৪।	গরীবদের প্রতি খেয়াল এবং তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান	২৩
১৫।	গরীবের মাল-সম্মতির সংরক্ষণ	২৬
১৬।	গোলাম বা দাসদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	২৭
১৭।	মানব-সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন	২৮
১৮।	নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ	২৮
১৯।	মৃত ব্যক্তিদের প্রতি আচরণ	৩২
২০।	প্রতিবেশীদের প্রতি সদ্ব্যবহার	৩২
২১।	পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার	৩৩
২২।	সৎ-সঙ্গ	৩৬
২৩।	মানুষের ঈমান-এর প্রতি খেয়াল	৩৬
২৪।	অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা	৩৭
২৫।	সবর বা ধৈর্য	৩৯

২৬। পরস্পর সহযোগিতা ৪০
২৭। সত্যবাদিতা ৪১
২৮। গোয়েন্দাগিরি না করা এবং সুধারণা পোষণ করা ৪২
২৯। ধোঁকাবাজি ও ফেরেববাজির প্রতি ঘৃনা ৪২
৩০। নৈরাশ্যবাদিতার বিরোধিতা ৪৩
৩১। প্রাণীদের প্রতি উত্তম আচরণ ৪৩
৩২। অন্যের কাজ বক্রদৃষ্টিতে না দেখা ৪৪
৩৩। ধর্মীয় সহনশীলতা ৪৪
৩৪। সাহসিকতা ৪৫
৩৫। স্বল্প বুদ্ধি বা অসংস্কৃতিবান লোকদের প্রতি স্নেহ ও মমতা ৪৫
৩৬। চুক্তি রক্ষা। ৪৬

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা

'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম' পুস্তকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র জিন্দেগীর অবস্থাসমূহের বিবরণ দেওয়ার পর এক্ষণে আমি তাঁর (সাঃ) পবিত্র চারিত্র্য সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে চাই। তাঁর (সাঃ) আখলাকে হাসনা বা তাঁর সুন্দর চরিত্র সম্পর্কে সমবেত সাক্ষ্য সেটাই যা দিয়েছিল তাঁর জাতি তাঁর নবুওয়ত-এর দাবীর পূর্বেই। তাঁর নাম তারা দিয়েছিল 'আমীন' এবং সিদ্দীক' (বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী) (সিরাত ঃ ইবনে হিশাম)

পৃথিবীতে এমন বহু লোক পাওয়া যায় যাদের সম্পর্কে বদ্‌দেয়ানতী বা অসততার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন লোকও অনেক থাকে, যাদেরকে কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না। হ্যাঁ, ছোটখাট মামুলী পরীক্ষা তো আসতেই পারে, এবং তাতে তাদের বিশ্বস্ততাও কায়েম থাকে। কিন্তু তাতে করে তাদের জাতি তাদেরকে কোন বিশেষ নাম বা উপাধি দেয় না। এটা এজন্যই হয় যে, বিশেষ কোন নাম বা উপাধি তখনই কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হয় যখন তিনি বিশেষ কোন গুণ-এর ক্ষেত্রে অপর সকলের চাইতে ঊর্ধ্বে উন্নীত হন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি সৈনিকই নিজের প্রাণকে বিপদাপন্ন করে তোলে। কিন্তু, এজন্য না বৃটিশরা প্রত্যেকটি সৈনিককে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' দেয়, না জার্মানরা প্রত্যেকটি সিপাহীকে 'আয়রন ক্রস' দিয়ে থাকে। ফ্রান্সে এমন লাখো লোক রয়েছেন যারা বিদ্যা-বুদ্ধিতে খ্যাতিমান হয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেককেই সেখানে 'লেজিয়ন অব অনার'(Legion of Honour) খেতাবে ভূষিত করা হয় না। অতএব, কোন ব্যক্তির পক্ষে শুধু আমানতদার এবং সাদেক (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী) হওয়াটাই তার মাহাত্ম্যের উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করার জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। কিন্তু কোন এক ব্যক্তিকে সমগ্র জাতিশুদ্ধ লোকের পক্ষ থেকে 'আমীন ও সিদ্দীক' (বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী) খেতাব দেওয়াটা কোনও চাট্টি খানি কথা নয়, বরং এ এক অসাধারণ ঘটনা। যদি মক্কার অধিবাসীরা তাদের প্রত্যেক প্রজন্মের লোকদের মধ্য থেকে এক একজন করে ব্যক্তিকে 'আমীন ও সিদ্দীক' উপাধি দিয়ে আসতো, তাহলেও সেক্ষেত্রেও অনুরূপ আমীন ও সিদ্দীক খেতাবধারী ব্যাক্তিবর্গকে ও জাতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপেই গণ্য করা হতো। কিন্তু আরবের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আরবরা তাদের প্রজন্মে প্রজন্মে এ ধরনের উপাধি কোন ব্যক্তিকেই দিত না। (এ ধরনের কোন প্রথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না)। বরং আরবদের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে এ ধরনের দৃষ্টান্ত মাত্র একজন মানুষ। এবং তিনিই হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তাঁকেই কেবল উপাধি দিয়েছিল আরববাসীরা 'আমীন' ও সিদ্দীক'। সুতরাং আরবের হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে জাতীয়ভাবে মাত্র একজন মানুষকেই এই আমীন ও সিদ্দীক উপাধি দান করাটাই এ কথার প্রমাণ যে, তাঁর (সাঃ) বিশ্বস্ততা এবং তাঁর সত্যবাদিতা এত বেশী উচ্চ স্তরের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল যে, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত আরবদের আর কখনই জানা ছিল না, কখনই

অনুরূপ কোন ব্যক্তির কথা ইতোপূর্বে তারা জানতে পারেনি। আরবরা তাদের তীক্ষ্ণ মেধার বা স্মৃতিশক্তির জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল, কাজেই, যে জিনিষকে তারা অনন্যরূপে স্বীকৃতি দিত, তা আসলেও অনন্য হওয়ারই যোগ্যতাসম্পন্ন হতো।

এছাড়া, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর নবুওয়তের দাবীর পূর্বে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে এক সামগ্রিক সাক্ষ্য দান করেছিলেন হযরত খাদিজা রাযি আল্লাহো আনহা। এ সম্পর্কে আমি পূর্বেই তাঁর (সাঃ) জীবন বৃত্তান্তের বর্ণনায় উল্লেখ করে এসেছি।

এখানে আমি তাঁর (সাঃ) চরিত্রের এমন কিছু কিছু দিকের বিবরণ দিতে চাই যাতে করে তাঁর চরিত্রের কোন কোন অজানা বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ও গোপন (দেহ ও মনের) পবিত্রতা

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পরিষ্কার জানা যায় যে, না তিনি কখনও কোন খারাপ কথা বলতেন, না কখনও অহেতুক কসম খেয়ে কিছু বলতেন (বুখারী)। আরবের মত দেশে বসবাস করে এই ধরনের চারিত্র্য অর্জন করা ছিল এক অসাধারণ ব্যাপার। এ কথা তো আমরা বলতে পারি না যে, আরবের লোকেরা তখন অভ্যাসগতভাবেই অশ্লীল বা ফাহেশা কথাবার্তা বলতো, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আরবরা কসম খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল। এবং আজও অব্দি আরবদের মধ্যে এই কসম খাওয়ার রেওয়াজ ব্যাপক আকারেই প্রচলিত আছে। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদাতা'লার প্রতি এত বেশী আদব বা শিষ্টাচার বজায় রেখে চলতেন যে, অযথা তাঁর নাম উচ্চারণ করাও পসন্দ করতেন না।

পাক-সাফ থাকার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনি প্রায় সময় মেসওয়াক করতেন এবং এ ব্যাপারে – (দাঁত-মুখ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে) এত বেশী জোর দিতেন যে, কখনো কখনো বলতেন, আমি যদি এই ভয় না করতাম যে, মুসলমানদের কষ্ট হবে, তাহলে আমি প্রত্যেক নামায-এর পূর্বে মেসওয়াক করার হুকুম দিতাম (মিশকাত)

খানা খাওয়ার পূর্বেও তিনি হাত ধুয়ে নিতেন, খাওয়ার পরেও হাত ধুয়ে ফেলতেন। কুল্লী করতেন। বরং, রান্না করা সব রকমের খাদ্য গ্রহণের পরই তিনি কুল্লী করতেন। এবং রান্না খাবার গ্রহণের পর কুল্লী না করে নামায পড়াকে অপসন্দ করতেন। (বুখারী)

মস্‌জিদ যা মুসলমানদের সমবেত হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান, তার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। এবং মুসলমানদেরকে এই কথা বার বার বলতেন যে, সমবেত হওয়ার বিশেষ দিনগুলিতে – জুমুআর দিনে – মসজিদগুলির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখবে এবং সেগুলিতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি জ্বালাবে, যাতে বাতাস পরিশুদ্ধ হয় (মিশকাত)। একইভাবে তিনি সাহাবাদেরকে (রাঃ) এই উপদেশ দিতেন যে, সম্মেলনের সময়ে কেউ যেন গন্ধযুক্ত কোন কিছু (পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি) খেয়ে মসজিদে না আসে (বুখারী)।

রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার রাখার জন্য তিনি বারবার উদ্বুদ্ধ করতেন। যদি রাস্তার উপরে কোন ঝাড়-জঙ্গাল কিংবা ইট পাথর কিংবা ময়লা আবর্জনা কিছু পড়ে থাকতে দেখতেন, তাহলে তিনি তা স্বয়ং নিজ হাতেই রাস্তার এক কোণায় সরায়ে রাখতেন। এবং বলতেন যে, যে ব্যক্তি রাস্তা-ঘাটের পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দেয় খোদা তার প্রতি খুশী হন এবং তাকে সওয়াব বা পুরস্কার দান করেন (মুসলিম) একইভাবে তিনি বলতেন যে, রাস্তায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করা না হয়। রাস্তার উপরে বসে থাকা, কিংবা রাস্তার উপরে এমন কিছু রেখে দেওয়া বা ফেলে রাখা যাতে পথচারীর কষ্ট হতে পারে, কিংবা রাস্তার উপরে মল-মূত্র ত্যাগ করা ইত্যাদি কাজ খোদাতা'লার দৃষ্টিতে পসন্দনীয় নয় (মেশকাত)

পানি পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে তিনি সবিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি সব সময় তাঁর সাহাবাগণকে (রাঃ) এই নসীহত করতেন যে, স্থির পানিতে যেন কোন নোংরা কিছু নিক্ষেপ না করা হয়। তেমনিভাবে, স্থির পানিতে প্রস্রাব-পায়খানা করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন তিনি। (বুখারী)

খানা-পিনায় সরলতা ও তাক্ওয়া (খোদা-ভীরুতা)

খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি (আঁ-হযরত-সাঃ) সর্বদা অত্যন্ত সরল বা সাদাসিদা ছিলেন। খাবারের মধ্যে লবণ বেশী হলো বা কম হলো কিংবা রান্না খারাপ হলো – এসব ব্যাপারে তিনি কখনই কিছু বলতেন না, বা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। এ ধরনের খাবার যতটা সম্ভব খেয়ে নিয়ে তিনি বাবুর্চীর মনোকষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু, যদি খাবার একেবারেই অযোগ্য হয়, তাহলে তিনি হাত সরিয়ে রাখতেন এবং কখনই বলতেন না যে, এই খাবার খেতে আমার অসুবিধা হচ্ছে। (বুখারী)

তিনি যখন খাওয়া শুরু করতেন, তখন খাদ্যের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বসতেন এবং বলতেন, আমার এ ধরনের ফুটানীর ভাব পসন্দ নয় যে, অনেকে এমনভাবে খানা-পিনা করে যেন খানা-পিনার বিষয়টা তাদের কাছে কোনও ব্যাপারই না। (বুখারী)

তাঁর কাছে যখন (খাবারের) কোন কিছু আসতো তখন তিনি তা সাহাবাদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন এবং নিজেও খেতেন। একবার তাঁর কাছে কিছু খেজুর (নজরানা স্বরূপ) এলো। তিনি হিসাব করে দেখলেন যে, প্রত্যেক সাহাবার ভাগে সাতটি করে খেজুর পড়ে, তিনি সাতটি করেই ভাগ করে দিলেন। (বুখারী)

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যব-এর রুটিও কখনো পেট ভরে খেতেন না।(বুখারী)। একদিন এক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন যে, কয়েকজন লোক একটি বকরী যবাই করে তার গোশ্ত রান্না (ভুনা) করে দাওয়াতের ব্যবস্থা করেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেয়ে লোকগুলি তাঁকেও দাওয়াত করলো, কিন্তু তিনি সেই দাওয়াত গ্রহণ করলেন না। (বোখারী)। তবে তার অস্বীকৃতি এজন্য ছিল না যে, তিনি ভুনা গোশ্ত খেতে পসন্দ করতেন না। বরং তা এজন্যই ছিল যে, তিনি এই ধরনের ব্যবস্থা পসন্দ

করতেন না যে, আশে পাশে গরীব দুঃখী মানুষের চলাফেরা করবে, আর এরা কিনা তাদের চোখের সামনেই বক্‌রী ভুনা করে খাবে। নইলে, অন্যান্য হাদীস থেকে তো এটা প্রমাণিত যে, তিনি ভুনা (রোষ্ট) করা গোশ্‌তও খেতেন।

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও এক নাগাড়ে তিন দিন পেট ভরে খানা খাননি। এবং এই অবস্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত চলেছিল। (বুখারী) খানা-পিনার ব্যাপারে তিনি (সাঃ) একটা বিষয়ে বিশেষ করে খেয়াল রাখতেন যে, কেউ যেন বিনা আমন্ত্রণে অন্যের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়ার জন্য কখনই না যায়। একবার এক ব্যক্তি তাঁকে নিমন্ত্রণ করলো এবং এই আবেদনও জানালো যে, আপনি আরও চারজনকে আপনার সঙ্গে নিয়ে আসবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি (সাঃ) বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে পঞ্চম এক ব্যক্তিও এসেছে। গৃহকর্তা যখন বাইরে এলো তখন তিনি (সাঃ) তাকে বললেন, আপনি আমাদের পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, আপনি চাইলে একেও অনুমতি দিতে পারেন, চাইলে না করে দিতে পারেন। গৃহকর্তা বললো, না, না, আমি ওঁকেও দাওয়াত করছি। উনিও ভিতরে আসুন। (বুখারী)

যখন তিনি (সাঃ) খাবার খেতেন, **বিস্‌মিল্লাহ** বলেই খাওয়া শুরু করতেন। এবং যখন খাওয়া শেষ করতেন তখন আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা করতেন এই বলে যে, সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌তা'লার যিনি আমাদেরকে খানা পিনা দান করেছেন। অনেক অনেক প্রশংসা। প্রত্যেক প্রকারের ত্রুটি বা কম্‌তি থেকে পবিত্র প্রশংসা। ক্রমবর্ধনশীল প্রশংসা। এমন প্রশংসা নয় যে প্রশংসা করার পর মানুষ মনে করবে যে, ব্যস, হয়ে গেছে, আমি যথেষ্ট প্রশংসা করেছি। বরং এটাই মনে করবে যে, প্রশংসা করার হক্ আদায় করা হলো না। এবং সে কখনই প্রশংসা করা ছেড়ে দিবে না। এবং কখনও মনের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হতে দিবে না যে, খোদাতা'লার এমন কোনও কাজ নেই যার প্রশংসা করবার প্রয়োজন নেই, কিংবা যা প্রশংসার যোগ্য নয়। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক ! তুমি আমাদেরকে এমনই করো। অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, কখনো কখনো তিনি এই বলেও দোয়া করতেন যে, সকল প্রশংসাই আল্লাহতা'লার যিনি আমাদের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দূর করে দিয়েছেন। আমাদের হৃদয় তাঁর প্রশংসা থেকে কখনই বিমুখ নয় এবং আমরা কখনই তাঁর অকৃজ্ঞতা করি না।

তিনি (সাঃ) সব সময় তাঁর সাহাবাদেরকে উপদেশ দিতেন, পেট ভরবার পূর্বেই খাওয়া ছেড়ে দিতে এবং বলতেন যে, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। (বুখারী)

কখনো কোন সময়ে তাঁর (রাঃ) বাড়ীতে যদি কোন উপাদেয় খাবার তৈরী করা হতো তখনই তিনি বাড়ীর সবাইকে নসীহত করতেন, পাড়া-পড়শীদের প্রতি খেয়াল রেখো। (মুসলিম) একইভাবে তিনি প্রতিবেশীদেরকে প্রায়শঃ উপঢৌকন পাঠাতেন। (বুখারী)

তিনি (সাঃ) তাঁর গরীব সাহাবাগণের চেহারা দেখে সব সময় ঠাহর করার চেষ্টা করতেন যে, তারা তো কেউ না-খেয়ে নেই। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার তিনি কয়েকদিন না-খেয়েই ছিলেন। যখন সাত বেলা না-খেয়েই কাটলো, তখন তিনি ক্ষুধায় অস্থির হয়ে মসজিদের দরজায় গিয়ে খাড়া হলেন। এই সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁকে এমন একটি আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলেন যার মধ্যে গরীবদেরকে খানা খাওয়ানোর হুকুম দেওয়া আছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর কথায় এটাই বুঝলেন যে, এই আয়াতের অর্থ তাঁর জানা নেই। তাই তিনি আয়াতটির মানে করে দিয়ে চলে গেলেন। হযরত আবু হোরায়রা যখন লোকদের কাছে এই ঘটনার বর্ণনা দিতেন তখন রাগ করে বলতেন যে, আবু বকর কি আমার চাইতে কোরআন বেশী জানতো ? আমি তো এজন্যই ঐ আয়াতের অর্থ পুঁছ করেছিলাম যে, এতে করে তাঁর ঐ আয়াতের উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল যাবে এবং সে আমাকে খাবার দিবে। পরে হযরত ওমরও (রাঃ) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি তাকেও এই আয়াতের মর্ম জিজ্ঞেস করেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ)-ও আয়াতটির অর্থ বলে দিলেন এবং চলে গেলেন। সাহাবারা (রাঃ) চাওয়া বা যাঞ্চা করাকে অত্যন্ত না-পসন্দ করতেন। আবু হোরায়রা যখন দেখলেন যে, না চাইলে খাবার পাওয়ার কোন উপায় আর নেই তখন তিনি বলছেন, আমি একদম মাতাল হয়ে পড়ে যেতে লাগল। কেননা, তখন আমার আর ধৈর্য ধারণ করারও শক্তি ছিল না। কিন্তু আমি তখনও দরজার দিক থেকে মুখ ফিরাইনি, এমন সময়, আমার কানে অত্যন্ত মমতাভরা এক আওয়াজ এলো, কেউ একজন আমাকে ডাকছিল 'আবু হোরায়রা ! আবু হোরায়রা !!' আমি মুখ ফেরালাম এবং দেখতে পেলাম যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরের খিড়কী খুলে খাড়া হয়ে আছেন এবং মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, আবু হোরায়রা ক্ষিদে পেয়েছে ? আমি বললাম, 'হাঁ, রসূলুল্লাহ, আমার ক্ষিদে পেয়েছে।' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের ঘরেও খাবার কিছু ছিল না। এখনই এক ব্যক্তি এক বাটি দুধ পাঠিয়ে দিয়েছে। তুমি মসজিদ যাও এবং দেখো, সেখানে হয়তো আমাদের মত আরও কোন কোন মুসলমান থাকতে পারে যাদের খাবার প্রয়োজন রয়েছে। আবু হোরায়রা (রাঃ) বলছেন, আমি মনে মনে বললাম, আমার তো এত ভূখ লেগেছে যে, ঐ বাটি-ভর্তি সব দুধ আমারই কুলোবে না। তারপর, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরও লোক ডাকতে বলছেন! তাহলে তো আমার ভাগে যা থাকবে তা তো থাকা না–থাকারই শামিল। কিন্তু, কী আর করা ! রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের হুকুম। গেলাম মসজিদের ভেতরে। দেখলাম, ছয় ব্যক্তি বসে আছে। ওদেরকেও সঙ্গে নিলাম এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার কাছে গেলাম। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রথমে ঐ দুধের বাটি ঐ ছয় ব্যক্তির এক জনের হাতে দিলেন এবং বললেন, খাও। যখন সে দুধ খেয়ে বাটি থেকে মুখ তুললো তখন তিনি (সাঃ) বললেন, আরও খাও। তৃতীয় বারের মত তিনি ঐ ব্যক্তিকে জোর করে দুধ খাওয়ালেন। একইভাবে তিনি

ছয়জন মানুষকেই বার বার দুধ খাওয়ালেন। হযরত আবু হোরায়রা বললেন, প্রত্যেক বারই আমি মনে মনে বলছিলাম যে, আমার কাজ সারা। আমার জন্য তো কিছু আর থাকলো না। কিন্তু, যখন ষষ্ঠ ব্যক্তির দুধ পান শেষ হলো তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুধের বাটিটা আমার হাতে দিলেন। আমি দেখলাম কি, তখনও বাটির মধ্যে অনেক দুধ রয়েছে। যখন আমি দুধ পান করলাম, তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম জোর করে আমাকেও বললেন, আরও খাও ! এইভাবে তিন তিন বার তিনি আমাকেও ঐ দুধ খাওয়ালেন। এবং আমার খাওয়ার পর বাঁচতি দুধ নিজে পান করলেন এবং খোদাতা'লার শোকর আদায় করতে করতে (ঘরের ভিতরে গিয়ে) দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হতে পারে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে সবার শেষে দুধ পান করতে দিয়েছিলেন এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যই যে, তিনি (রাঃ) যেন খোদাতা'লার উপরে ভরসা রেখে ক্ষুধা নিয়েই বসে থাকেন এবং ইশারা-ইংগিতেও কিছু না চান।

তিনি (সাঃ) সব সময় ডান হাত দিয়ে খাবার খেতেন এবং ডান হাত দিয়েই পানি পান করতেন। পানি পান করার সময় মধ্যখানে তিন বার শ্বাস নিতেন। এর মধ্যে একটা স্বাস্থ্যগত হেকমতও ছিল। কেননা, পানি যদি একদমে খাওয়া হয়, তাহলে বেশী পরিমাণে খাওয়া হয়। এবং এতে করে হজমে গোলমাল দেখা দেয়। খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর নীতি এটাই ছিল যে, যে খাদ্য পবিত্র ও পরিমিত তা-ই খাওয়া উচিত। কিন্তু, এতে যেন গরীবদের হক্ মারা না যায়, কিংবা মানুষ যেন পেটুক হয়ে না পড়ে। বস্তুতঃ, সাধারণভাবে যেমন বলা হয়েছে যে, তিনি অত্যন্ত সাদাসিদে খাবারই খেতেন। তথাপি, কোন ব্যক্তি যদি কোন কিছু তোহফা বা উপহারস্বরূপ নিয়ে আসতো, তাহলে তিনি তা খেতে অস্বীকার করতেন না। কিন্তু, সাধারণতঃ, তিনি খানা-পিনার ব্যাপারে উত্তম বা উপাদেয় খাবার সংগ্রহের চেষ্টা কখনই করতেন না। এজন্যই হতে পারে যে, তিনি খেজুরই পসন্দ করতেন বেশী, এবং বলতেন যে, খেজুর ও মুমেন-এর মধ্যে একটা আত্মীয়তা রয়েছে। খেজুরের পাতা, এর ছিল্কা এর কাঁচা ফল, পাকা ফল, এর আঁটি সব কিছুই কাজে আসে। এর কোন কিছুই অযথা নষ্ট হয় না। প্রকৃত মুমিনও এমনিই হয়ে থাকে। তারও কোন কাজই বৃথা যায় না। বরং তার প্রত্যেকটি কাজই মানব জাতির কল্যাণের জন্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। (বুখারী)

পোষাক ও গহণা-পাতির ক্ষেত্রে সরলতা ও খোদা-ভীরুতা (তাক্ওয়া)

পোষাক-এর ব্যাপারেও রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত সাদাসিদা ব্যবস্থাই পসন্দ করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পোষাক ছিল কোর্তা (পাঞ্জাবী) এবং তহবন্দ (লুঙ্গী) কিংবা পাঞ্জাবী ও পাজামা। তিনি তাঁর লুঙ্গী বা পাজামা পরতেন হাঁটুর নীচে টাখনুর উপর পর্যন্ত। হাঁটু বা হাঁটুর উপরের কোন অংশ নাংগা হয়ে যাওয়া তিনি পসন্দ করতেন না। তবে বাধ্য-বাধকতা থাকলে সে ভিন্ন কথা। এমন কাপড় যার উপর ছবি

আঁকা থাকতো তা তিনি পসন্দ করতেন না। তা সে পরনের কাপড়ই হোক আর টানানো পর্দা ইত্যাদিই হোক। বিশেষ করে বড় বড় ছবি, যা কিনা শির্ক বা অংশীবাদিতার ইঙ্গিতবহ সেগুলোর ছাপযুক্ত কাপড় ব্যবহারের অনুমতি তিনি কখনই দিতেন না। এই ধরনের কাপড় একবার তিনি তাঁর ঘরে লটকানো দেখতে পেয়ে তা খুলে ফেলে দিয়েছিলেন (বুখারী)। তবে, যে সব কাপড়ে ছোট ছোট ছবি আঁকা থাকতো সেগুলির ব্যাপারে তাঁর আপত্তি থাকতো না ; কেননা, এগুলির মাধ্যমে শিরক-এর প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার মত ইঙ্গিত থাকতো না। তিনি নিজে কখনই রেশ্‌মী কাপড় (সিল্ক) পরতেন না এবং অন্যান্য পুরুষদেরকেও রেশ্‌মী কাপড় পরার অনুমতি দিতেন না।

তিনি (সাঃ) রাজা-বাদশাহদের কাছে প্রেরিত চিঠি-পত্রে ব্যবহারের জন্য তাঁর সীলমোহরের ছাপযুক্ত একটি আংটি বানিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু, তিনি বলে দিয়েছিলেন, সেটা যেন সোনার আংটি না হয় রূপোর হয়। কেননা, খোদাতা'লা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য সোনা পরা নিষেধ করে দিয়েছেন। তবে, মেয়েদের জন্য রেশমী কাপড় পরারও অনুমতি আছে, সোনার গহনা পরারও অনুমতি আছে। এ ব্যাপারে তিনি উপদেশ দিতেন যে, বাড়াবাড়ি যেন করা না হয়। একবার তিনি গরীবদের জন্য চাঁদা দেওয়ার আহ্‌বান জানালেন। এক মহিলা একটি কঙ্কণ বের করে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, অপর হাতটির কি দোজখ থেকে বাঁচবার অধিকার নেই ? মহিলাটি তখন অপর হাতের কাঁকণটিও গরীবদের জন্য দিয়ে দিলেন। তাঁর (সাঃ) বিবিগণের (রাঃ) গহণা-পাতি ছিল না বললেই চলে। অন্যান্য মুসলিম মহিলারাও, তাঁর শিক্ষার অনুসরণে, জেওর-অলংকার বানানো থেকে বিরত থাকতেন। তিনি কোরআনী শিক্ষা মোতাবেক বলতেন যে, মাল-সম্পদ জমা করে রাখলে গরীবদের অধিকার খর্ব করা হয়। এ কারণেই, সোনা-চান্দি ঘরে জমা করে রাখলে, তা জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে। এবং তা পাপও বটে।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর (সাঃ) কাছে নিবেদন করলেন, এখন তো বড় বড় রাজা-বাদশাহ্‌দের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রদূতরা আসছেন, আপনার জন্য একটা দামী জুব্বা দরকার, যাতে করে আপনি তা প্রয়োজনে পরতে পারেন। তিনি (সাঃ) হযরত ওমরের এই কথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, খোদাতা'লা তো এজন্য আমাকে পয়দা করেন নি। এসব তো তোষামদের কথা! আমার যে পোষাক সেই পোষাকেই আমি দুনিয়ার সবার সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ করবো। একবার তাঁর (সাঃ) কাছে একটি রেশমী জুব্বা আনা হলো। তিনি সেটা হযরত ওমরকে তোহ্‌ফা স্বরূপ দিয়ে দিলেন। পরের দিন তিনি দেখতে পেলেন যে, হযরত ওমর সেটা পরে ঘুরাফেরা করছেন। তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্‌ ! আপনিই তো এটা আমাকে তোহ্‌ফা দিয়েছেন ! তিনি (সাঃ) বললেন, প্রত্যেকটি জিনিষ তো নিজের ব্যবহারের জন্যে হতে পারে না। অর্থাৎ, এই জুব্বাটা যেহেতু রেশ্‌মী ছিল, সেহেতু তাঁর (রাঃ) উচিত ছিল, ওটা তাঁর বিবিকে দিয়ে দেওয়া, কিংবা বেটীকে দিয়ে দেওয়া। কিংবা অপর কেউ হলেও ওটা ব্যবহার করতে পারতো। জুব্বাটা তাঁর (রাঃ) নিজের পোষাক হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক হয় নি। (বুখারী)

বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে সরলতা

তাঁর (সাঃ) বিছানা-পত্রও ছিল নিতান্ত সাদাসিদে। সাধারণতঃ একটি চামড়া কিংবা উটের পশম দিয়ে তৈরী একটি কাপড়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেছেন, আমাদের বিছানা এত ছোট ছিল যে, যখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহোতা'লা আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রে এবাদত করার জন্য উঠতেন তখন আমি একপাশে করে গিয়ে জড়ো হয়ে থাকতাম। এর কারণ ছিল এটাই যে, বিছানাটা ছিল ছোট। যখন এবাদতের সময় তিনি খাড়া হতেন তখন আমি হাঁটু সোজা করতে পারতাম, আর যখন তিনি সিজদা করতেন তখন আমি হাঁটু জড়ো করে নিতাম। (বুখারী)

বাড়ী ও বসবাস-এর ক্ষেত্রে সরলতা

বাসগৃহের ব্যাপারেও তিনি (সাঃ) সাদাসিদে থাকাই পসন্দ করতেন। সাধারণতঃ তার ঘরগুলো হতো এক-কামরার এবং তার সামনে ছোট আঙ্গিণা। সেই কামরার মাঝখান দিয়ে টানানো থাকতো একটা রশি। রশিটার উপরে কাপড় ঝুলে দিয়ে তিনি আলাদা এক পাশে সাক্ষাতপ্রার্থীদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি চারপায়ী বা চৌকি বা খাট ব্যবহার করতেন না। বরং, মাটির উপরেই বিছানা পেতে শুতেন। তিনি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এত বেশী সাদাসিদে ছিলেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর ওফাতের পরে বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবিতকালে আমাদেরকে কয়েকবার শুধু পানি আর খেজুর খেয়েই দিন কাটাতে হয়েছিল। এমনকি, যেদিন তাঁর মৃত্যু হয় সেদিনও আমাদের ঘরে পানি ও খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। (বুখারী)

খোদাতা'লার সঙ্গে মহব্বত এবং এবাদত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতি তাকালে দেখা যায় যে, সমস্ত জীবন ছিল ইশ্‌কে ইলাহীতে (ঐশী-প্রেম) নিমজ্জিত। জামাতী গুরু দায়িত্বাবলী সম্পাদন করার পরও তিনি দিনরাত এবাদতের মধ্যে মশগূল থাকতেন। অর্ধেক রাত কেটে গেলে পরই তিনি খোদাতা'লার এবাদতের জন্য খাড়া হয়ে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত এবাদত করতে। এমনকি, কোন কোন সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেতো, এবং তাঁর সেই অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি লোকেদের দয়া হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, একবার এই রকম এক অবস্থায় আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনি তো খোদাতা'লার সান্নিধ্য ও সন্ধান পেয়েই গেছেন, আপনি আপনার প্রাণের উপরে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন ? জবাবে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, হে আয়েশা ! আমার কি উচিত নয় তাঁর ভালবাসার জন্য তাঁর শোকরগোজারী করা ? এ কথা যখন সত্য যে, খোদাতা'লার নৈকট্য আমি লাভ করেছি, এবং খোদাতা'লা আপন কৃপাবশে তাঁর নৈকট্য আমাকে দান করেছেন, তখন এটা কি আমার কর্তব্য নয় যে, আমি যতটা পারি তাঁর শুক্‌রিয়া আদায় করি ? (তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ?)। কেননা, কৃতজ্ঞতা তো কৃপার পরিবর্তেই জ্ঞাপন করা হয়।(বুখারী)

তিনি (সাঃ) কোন বড় কাজ খোদার প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া করতেন না। তাই তাঁর সম্পর্কে লিখিত হয়েছে যে, মক্কার লোকদের দুর্বিসহ যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ততদিন পর্যন্ত মক্কা ছেড়ে চলে আসেননি, যতদিন পর্যন্ত খোদাতা'লার তরফ থেকে তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়নি, এবং সেই ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়নি। মক্কাবাসীদের অত্যাচারের তীব্রতা ও কঠোরতা দেখে তিনি যখন সাহাবাদেরকে (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, এবং তারা যখন তাঁর কাছে এই আশা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তিনিও যদি তাঁদের সঙ্গে যেতেন ; তখন তিনি বললেন, আমি তো এখনও খোদাতা'লার অনুমতি পাইনি। অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের সময়ে মানুষ যখন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসে, এবং সবাই মিলে এক সাথে থাকে, তখনই তিনি তাঁর জামাতের লোকদেরকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে যাওয়ার উপদেশ দিলেন এবং নিজে একাই মক্কায় থেকে গেলেন। এবং এটা তিনি এজন্যই করেছিলেন যে, তখনও পর্যন্ত তাঁর খোদা তাঁকে হিজরত করবার আদেশ দেননি।

তিনি যখনই খোদাতা'লার কালাম (কোরআন) শুনতেন তখনই আবেগে আকুল হয়ে যেতেন এবং তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠতো। বিশেষতঃ, ঐ সকল আয়াত শুনলে, যেগুলিতে তাঁর দায়িত্ব ও জিম্মাদারীর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'আমাকে কোরআন শরীফের কিছু আয়াত পড়ে শোনাও।' আমি বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! কোরআন তো আপনার উপরেই অবতীর্ণ হয়েছে, আমি আপনাকে কি শোনাব !' তিনি বললেন, 'অন্য লোকদের কাছ থেকেও কোরআন পড়া শুনতে আমার খুব ভাল লাগে'। তখন আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

(অর্থাৎ ঐ সময়ের অবস্থা কী হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতি বা উম্মত থেকে তাদের নবীকে সেই উম্মতের সামনে খাড়া করে সেই উম্মতের হিসাব নিব ! এবং তোমাকেও তোমার উম্মতের সামনে খাড়া করে তাদের হিসাব নিব।) – তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ব্যস ! এখন থামো ! এখন থামো !' আমি তাঁর দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর দু'চোখ ভরে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে। (বুখারী)

নামায-এর অনুবর্তিতা ও পাবন্দীর প্রতি তাঁর এত বেশী খেয়াল ছিল যে, কঠিন অসুখের অবস্থাতেও যখন কিনা ঘরে নামায পড়ার এবং শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার এযাযত বা অনুমতি খোদাতা'লার তরফ থেকে রয়েছে – তখনও তিনি অপরের সাহায্য নিয়ে মসজিদে নামায পড়তে আসতেন। একদিকে তিনি নামাযে যেতে না পারায় হযরত আবু বকরকে (রাঃ) নামায পড়াবার হুকুম দিয়ে পাঠালেন কিন্তু একটু পরেই শরীরটা কিছু ভাল লাগায়, তৎক্ষণাৎ দু'জন মানুষের ঘাড়ে ভর করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু দুর্বলতা এত বেশী ছিল যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন, যাওয়ার সময় তাঁর পা দু'টি মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার সবখানেই আনন্দ প্রকাশ ও সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাততালি দেওয়া হয়। আরবদের মধ্যেও এই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাঁর (সাঃ) কাছে খোদাতা'লার স্মরণ এবং তাঁর যিকর এত বেশী পসন্দনীয় ছিল যে, এসব ক্ষেত্রেও তিনি যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারণের হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন একটা কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন, ইতোমধ্যে নামাযেরও সময় উপস্থিত। তিনি হুকুম করলেন, 'আবুবকর ! নামায পড়িয়ে দাও।' তারপর জলদি কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনিও মসজিদে গেলেন। মুসল্লীরা যখন বুঝতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে এসে গেছেন, তখন তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে হাততালি দেওয়া শুরু করলেন। এর দ্বারা তাঁরা একদিকে যেমন প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনে তাঁদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছে, অপরদিকে তাঁরা আবুবকর (রাঃ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে, এখন তাঁকে (রাঃ) ইমামতী ছেড়ে দিতে হবে, কেননা এখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত আবুবকর পিছে সরে এলেন এবং ইমাম-এর জায়গা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য খালি করে দিলেন। নামায-এর পরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবুবকর! আমি তোমাকে নামায পড়াবার হুকুম দিয়েছিলাম, তুমি কেন আমি আসাতে পিছনে সরে গেলে ?' আবুবকর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! আল্লাহর রসূলের উপস্থিতিতে আবু কোহাকার বেটা কী এমন যোগ্যতা রাখে যে, সে নামায পড়াবে !' এরপর তিনি (সাঃ) সাহাবাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাদের কী দরকার ছিল তালি বাজাবার ? খোদাতা'লার যিক্‌র করার সময় তালি বাজানো তো ঠিক না। যদি নামাযের সময় এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন, তাহলে হাততালি দেওয়ার বদলে বুলন্দ আওয়াজে খোদার নাম উচ্চারণ করবে। এবং এটা করলেই অন্য সকলের দৃষ্টি আপনা আপনি সেদিকে আকৃষ্ট হবে। (বুখারী)

তিনি (সাঃ) খুব কষ্ট করে এবাদত করাও পসন্দ করতেন না। একবার তিনি ঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে দু'টি খাম্বার মধ্যখানে একটি রশি ঝুলানো। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে রশিটা কেন লটকানো হয়েছে ? কেউ কেউ বললেন, এটা হযরত যয়নব (রাঃ)-এর রশি। যখন তিনি (রাঃ) এবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন তিনি এই রশিটা ধরে নিজেকে সামলিয়ে রাখেন। তিনি (সাঃ) বললেন, 'এমনটা করা তো উচিত না। রশিটা খুলে ফেলো। প্রত্যেকের উচিত এবাদত ততক্ষণ পর্যন্তই করা যতক্ষণ তার হৃদয় স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল থাকে। যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার বসে পড়া উচিত। এ ধরনের কষ্টকর এবাদতে কোন ফায়দা নেই।" (বুখারী)

শিরক বা অংশীবাদিতার প্রতি তাঁর (সাঃ) এত বেশী ঘৃণা ছিল যে, মৃত্যুর সময়েও যখন তিনি জান-কান্দানির কষ্টে কখনো ডানে এবং কখনো বামে করোট ফিরছিলেন, তখনও বল্‌তেছিলেন 'খোদা ঐসব ইহুদী ও নাসারার উপর লানত করুন, অভিসম্পাৎ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে' (বুখারী)। অর্থাৎ তারা তাদের

নবীদের কবরগুলোর উপরে সিজ্‌দা দেয় এবং তাঁদের (আঃ) কাছে প্রার্থনা জানায়। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, তাঁর উম্মত যদি এই ধরনের কাজ করে, তাহলে তারা যেন মনে না করে যে, তারা তার দোয়ার হকদার হবে বরং তিনি তাদের উপরে দারুণভাবে অসন্তুষ্ট হবেন। খোদাতা'লার জন্য আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গায়রত বা আত্মাভিমানের কথা তাঁর জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে। মক্কার লোকেরা তাঁর সামনে প্রত্যেক প্রকারের উৎকোচ বা রিশ্‌ওয়াত পেশ করেছিল, শুধু এই জন্যই যে, তিনি যেন মূর্তি-গুলোর বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, মুর্তিপূজার বিরুদ্ধে না বলেন। তাঁর চাচা আবু তালেবও তাঁকে এ বিষয়ে সুপারিশ করে ছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তুমি যদি একথা মেনে না নাও, এবং আমি যদি তোমাকে না ছাড়ি, তাহলে আমার জাতি আমাকেই ছেড়ে দেবে, পরিত্যাগ করবে। (আবু তালেবের) এই কথার উত্তরে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার চাচা ! এই লোকগুলো যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চন্দ্রকে আমার বামে এনে খাড়া করে দেয়, তবুও আমি এক আল্লাহর তৌহীদ বা একত্বের প্রচার থেকে বিরত হতে পারব না।' ঠিক একইভাবে, ওহোদ-এর যুদ্ধের সময়ে মুসলমানরা যখন আহত এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় এক পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়েছিল, এবং দুষমন তাদের সমর-সজ্জা ও সরঞ্জামসহ আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিল, উচ্চস্বরে বলছিল, 'আমরা মুসলমানদের শক্তি চূর্ণ করে দিয়েছি'। এবং আবু সুফিয়ান শ্লোগান দিচ্ছিল, 'উলো হোবল, উলো হোবল' - অর্থাৎ হোবল-এর মহিমা উন্নত হোক, হোবল-এর মহিমা উন্নত হোক। তখন তিনি (সাঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে যাঁরা শত্রুর দৃষ্টির আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তখন লুকানো অবস্থায় থাকাটাই ছিল তাঁদের জন্য মঙ্গলজনক - তাঁদের হুকুম দিলেন, ' জবাব দাও, **আল্লাহো আ'লা ও আজাল্লো, আল্লাহো আ'লা ওয়া আজাল্লো।**' আল্লাহ্‌র মহিমাই সবার উর্ধ্বে উন্নত, তিনি শক্তি ও প্রতাপের অধিপতি, আল্লাহ্‌ই বিজয় ও মহাপ্রতাপের অধিকারী।

খোদাতা'লার জন্য রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে গায়রত বা আত্মাভিমান ছিল, তার আরও একটি মহান-আজিমুশ্‌শান-দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনীতে। ইসলামের পূর্বে সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই ধারণাটা প্রচলিত ছিল যে, নবীগণের খুশী ও অ-খুশীর কারণেই যমীন ও আসমানে পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে ; এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির নিয়ন্ত্রণও তাঁদেরই হাতে। এমনকি একজন নবী সম্পর্কে এমন কথাও বলা হতো যে, তিনি সূর্যকে বলেছিলেন, 'থেমে যাও'। এবং সূর্যটা নাকি থেমেই গিয়েছিল। আর একজনের সম্পর্কে বলা হতো যে, তিনি চাঁদের পরিক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অপর একজন নাকি পানির স্রোতকে স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, ইসলাম এই জাতীয় ধ্যান-ধারণার ভ্রম প্রকাশ করে দিয়েছিল। এবং বলে দিয়েছিল যে, এগুলো আসলে রূপক বর্ণনা ; এগুলো থেকে লাভবান না হয়ে, মানুষ বরং উল্টো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল, কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল। তথাপি, এগুলোর – (এই কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর) – অপনোদন সত্ত্বেও, কিছু কিছু মানুষের মনের উপরে ঐ জাতীয় ধারণার প্রভাব থেকেই গিয়েছিল। যথা, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শেষ বয়সের একমাত্র পুত্রসন্তান সাহেবযাদা ইব্রাহীম আড়াই বছর বয়সে মারা গেলেন।

তখন ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্যগ্রহণ লাগলো। সেদিন কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় প্রচার শুরু করে দিলো যে, দেখ ! রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছেলের মৃত্যুতে সূর্য অন্ধকার হয়ে গেছে। এই কথা যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম শুনলেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এবং তিনি এতে চুপ করেও থাকলেন না। বরং, তা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, এবং বললেন 'চন্দ্র এবং সুর্য তো খোদাতা'লার নির্ধারিত নিয়মাবলীর প্রকাশকারী ও অনুসরণকারী অস্তিত্ব। ছোট কিংবা বড় কোন মানুষের জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে ওদের কী সম্পর্ক ? (বুখারী)। যখন কোন ব্যক্তি আরবের প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বলতো যে, অমুক নক্ষত্র আকাশের অমুক অবস্থানে আসার দরুন বৃষ্টি হলো ; তখন তাঁর (সাঃ) চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিত এবং তিনি বলতেন, 'হে লোকেরা! খোদাতা'লার নেয়ামতসমূহকে তোমরা কেন অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করছো ? বৃষ্টি ইত্যাদি সব কিছুই খোদাতা'লার নির্ধারিত নিয়মে হয়ে থাকে। এ সব কোন দেবতা বা অন্য কোন আধ্যাত্ম শক্তির কৃপার কারণে কিংবা তাদের কোন পুরস্কার দানের কারণে অবতীর্ণ হয় না। (মুসলিম)

খোদাতা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা

হযরত রসূলে পাক (সাঃ)-এর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি আস্থা ও ভরসা-তাওয়াক্কুল-এর অবস্থা এই ছিল যে, একদিন এক ব্যক্তি তাঁকে একলা পেয়ে তাঁর উপরে তরবারি উঁচিয়ে ধরে তাঁকে বললো, 'এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে' ? ঐ সময়ে তাঁর (সাঃ) হাতে কোন হাতিয়ার ছিল না এবং তিনি শোয়া অবস্থায় ছিলেন। কাজেই তাঁর পক্ষে কোন কিছু করার কোনও উপায়ও ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও, তিনি (সাঃ) অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্তভাবে প্রশান্তচিত্তে উত্তর দিলেন – **'আল্লাহ্'**। এই শব্দ তাঁর মুখ থেকে এত দৃঢ় – বিশ্বাস এবং আস্থা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিলো যে, সেই কাফেরের হৃদয়ও তাঁর (সাঃ) ঈমান-এর আশ্চর্য শক্তি এবং তাঁর ইয়াকীন-এর প্রখর প্রভাবে অভিভূত না হয়ে পারেনি। ফলে, তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। এবং সে যে কিনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল – তাঁর (সাঃ) সামনে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো। (মুসলিম)

আল্লাহতা'লার সামনে তাঁর (সাঃ) বিনয়-এর সীমা এটাই ছিল যে, যখন লোকেরা তাঁকে বলতেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি তো আপনার সৎকর্ম বা আমল এর জোরেই খোদাতা'লার ফযল, আশিস ও কৃপা লাভ করতে পারবেন।' তখন উত্তরে তিনি বলতেন, 'আমিও খোদার অনুগ্রহের কল্যাণেই নাজাত (পরিত্রাণ) লাভ করবো"। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি একদিন রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, কোন ব্যক্তিই নিজের আমল-এর জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না। 'আমি তখন বললাম, কি ? আপনি ও কি আপনার আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না ? তিনি বলেছিলেন, না, আমিও নিজের আমল-এর জোরে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না। তবে, খোদার কৃপা ও তাঁর রহমত যদি আমাকে আবৃত করে নেয়, তাহলে, একটা উপায় হতে পারে (বুখারী)। তিনি

(সাঃ) বলেছিলেন, 'নিজের কাজেকর্মে পুণ্য অবলম্বন করো, এবং খোদাতা'লার নৈকট্যের পথ অনুসরণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন মৃত্যুর কামনা না করে কেননা, সে যদি সৎ হয়, তাহলে সে জীবিত থেকে আরও বেশী বেশী সৎকাজ করতে পারবে ; আর যদি সে অসৎ হয়, তাহলে জীবিত থেকে সে তার পাপসমূহের জন্য তওবা করবার সুযোগ পাবে"। (বুখারী)

খোদাতা'লার প্রতি তাঁর (সাঃ) ভালবাসার অবস্থা এই ছিল, শুকনো মৌসুমের পর যখন প্রথম বৃষ্টি নামতো তখন তিনি তাঁর জিহ্বায় বৃষ্টির ফোঁটা নিতেন এবং বলতেন, 'দেখো ! আমার প্রতিপালকের তাজা নেয়ামত।'

যখনই কোন মজলিসে বসতেন তো ইস্তেগফার (ক্ষমা-প্রার্থনা) করতেন। এবং এমনিতেই সব সময় ইস্তেগফার করতেন, যাতে করে তাঁর উম্মত এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাই খোদাতা'লার গযব (ক্রোধ) থেকে বেঁচে থাকে এবং তাঁর ক্ষমার অধিকারী হয়ে যায় (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি (সাঃ) সর্বদাই খোদাতা'লার সামনে হাজির থাকবার কথা মনে রাখতেন। এমনকি, তিনি যখন শুইতে যেতেন তখনও এই কথা বলতে বলতে শুইতেন ঃ . . . . . .'হে আল্লাহ্ ! তোমারই নাম নিয়ে আমি মরি, এবং তোমারই নাম নিয়ে আমি উঠি।' এবং যখন তিনি প্রত্যেষে উঠতেন তখন বলতেন ঃ . . . . . .'সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন, এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।' (বুখারী)

তাঁর খোদাতা'লার নৈকট্য লাভের আকাংখা এত প্রবল ছিল যে, তিনি সর্বক্ষণ দোয়া করতেন ঃ . . . . . .'হে আমার প্রভু ! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার নুর - আলো-দ্বারা ভরপুর করে দাও, আমার চোখও তোমার আলোতে ভরে দাও, আমার কানও তোমার আলোতে ভরে দাও, আমার ডানেও এবং আমার বামেও তোমার আলো দ্বারা আলোকিত করে দাও। আমার উর্ধ্ব তোমার আলোকে আলোকিত হোক, আমার নিম্নও তোমার আলোকে আলোকিত হোক। এবং হে আমার প্রভু ! আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আলোয় আলো বানিয়ে দাও'। (বুখারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তাঁর (হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের) ওফাতের কিছুদিন পূর্বে মুসায়লামা কায্যাব এসেছিল এবং সে বলেছিল, যদি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরে আমাকে শাসনকর্তা নিয়োগ করে যান তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেব।' ঐ সময় তার সঙ্গে ছিল একটি বিশাল বাহিনী এবং যে কওমের (গোত্রের) সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল (অর্থাৎ যে কওমের প্রতিনিধি সে ছিল), সেই গোত্রটিও ছিল আরবের সকল গোত্রের মধ্যে জন সংখ্যায় সর্বাধিক বৃহৎ। রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে যখন মদীনায় আগমনের খবর গিয়ে পৌঁছলো, তখন তিনি (সাঃ) তার কাছে চলে গেলেন। সাবেত বিন কায়েস বিন শামস তাঁর (সাঃ) সঙ্গে ছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতে ছিল খেজুরের একটা ডাল। তিনি (সাঃ) সেই কাফেলার

কাছে গেলেন এবং মুসায়লামা কায্যাবের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এই পরিস্থিতিতে অন্যান্য সাহাবীরাও সেখানে এসে সমবেত হলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) মুসায়লামাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি তো এই কথা বলতে এসেছ যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি তাঁর পরে তোমাকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করেন, তাহলে তুমি তাঁর (সাঃ) আনুগত্য স্বীকারে প্রস্তুত আছ। কিন্তু, আমিতো খোদার হুকুমের খেলাফে তোমাকে এই খেজুরের ডালটা দিতেও প্রস্তুত নই। তোমার পরিণতি তা-ই হবে, যা খোদা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন তোমার জন্য। যদি তুমি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেও চলে যাও তো আল্লাহতা'লা তোমার পা দুটো কেটে দিবেন। এবং আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে, খোদা যা কিছু আমাকে দেখিয়েছিলেন, তা সবই এখন সংঘটিত হওয়ার সময় এসে যাচ্ছে।' অতঃপর, তিনি (সাঃ) বললেন, 'আমি চলে যাচ্ছি, তোমার যদি কোন কথা থাকে, তুমি তা সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্স-এর কাছে বলতে পার, সে-ই থাকলো আমার পক্ষে।' এই কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। হযরত আবু হোরায়রাও (রাঃ) ছিলেন তাঁর সঙ্গে। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে (সাঃ) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনি এটা কী বললেন, খোদা আমাকে যা কিছু দেখায়েছেন, আমি তোমাকে তেমনিই দেখতে পাচ্ছি।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি রুইয়াতে (স্বপ্নে) দেখেছিলাম যে, আমার হাতে দু'টি কংকণ। আমি ঐ কংকণ দুটি দেখে না-পসন্দ করেছিলাম। ঐ সময়ে স্বপ্নের মধ্যেই আমার প্রতি এই ওহী অবতীর্ণ হলো যে, আমি যেন ওগুলির উপরে ফুঁ দিই। যখন আমি ফুঁ দিলাম, তখন দুটো কংকণই উড়ে গেল। আমি এই স্বপ্নের তাবীর (ব্যাখ্যা) এটাই করেছিলাম যে, আমার পরেই দুজন মিথ্যা দাবীদারের আবির্ভাব ঘটবে। (বুখারী)

তখন ছিল রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ অধ্যায়। আরবের উক্ত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্বশেষ গোত্রটিও আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল ; শুধু এতটুকুই শর্ত দিয়েছিল যে, তাদের নেতাকে রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পরে খলীফা নিয়োজিত করবেন। যদি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মনে মনে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের কোন ধারণা পোষণ করতেন, তাহলে এইরূপ অবস্থায় যখন তাঁর নিজেরও কোন পুত্র সন্তান ছিল না – তখন তাঁর জন্য এতে কোন অসুবিধাই ছিল না যে, তিনি আরবের সব চাইতে বড় গোত্রটির সব চাইতে বড় নেতাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে রাজি হতেন, এবং সমগ্র আরবে ঐক্য স্থাপনের রাস্তাও উন্মুক্ত করে দিতেন। কিন্তু, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম, যিনি ছোট থেকে ছোট কোন জিনিসকেও নিজের বলে মনে করতেন না, তিনি কীভাবে ইসলামী এমারত বা প্রশাসনকে নিজের রাজত্ব বলে মনে করতে পারেন ! তাঁর কাছে ইসলামী এমারত ছিল খোদাতা'লার আমানত। এবং সেই আমানত হুবহু অবস্থায় খোদার কাছে সোপর্দ করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। অতঃপর খোদা যাকে চাইবেন তার হাতেই তুলে দিবেন সেই আমানত। সুতরাং, তিনি (সাঃ) ঐ প্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এবং বলেছিলেন, রাজত্ব, সে তো ভিন্ন কথা, খোদার হুকুম ছাড়া আমি খেজুরের একটি ডালও তোমাকে দিতে প্রস্তুত নই।

আঁ হযরত (সাঃ) যখনই আল্লাহতা'লার নাম নিতেন তখনই আবেগে-আপ্লুত হয়ে উঠতেন। এবং মনে হতো যে, তাঁর দেহের বাইর এবং ভেতর-তাঁর গোটা অস্তিত্বই সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়তো। আল্লাহ্তা'লার এবাদত করার ক্ষেত্রেও তিনি সরলতাকে এত বেশী পসন্দ করতেন যে, মসজিদের ভেতরে যেখানে কোন ফরাশ থাকতো না, কোন কাপড় বা চাদর থাকতো না, তিনি সেখানেই নামায পড়তেন এবং অন্যদেরকেও পড়াতেন। কয়েকবার এমনও হয়েছিল যে, বৃষ্টির দরুন ছাদ চুষে পানি পড়তো এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শরীর ও কাপড় পানিতে ভিজে লুটোপুটি হয়ে যেত। কিন্তু তিনি তাঁর এবাদতেই মশগুল থাকতেন, এবং তাঁর মনের মধ্যে সামান্যতম চিন্তারও উদ্রেক হতো না যে, তাঁর শরীর ও কাপড়-চোপড় বাঁচাবার জন্য নামায আপাততঃ মূলতবী রাখা দরকার কিংবা অন্য কোন জায়গায় গিয়ে পড়া দরকার। (বুখারী)

তিনি (সাঃ) তাঁর সাহাবাগণের এবাদতের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) – যিনি অত্যন্ত নেক ও পবিত্র খাসলত বা অভ্যাসের মানুষ ছিলেন তাঁর সম্পর্কে তিনি (সাঃ) বললেন, 'আব্দুল্লাহ বিন ওমর কতই না উন্নত মানুষ হতো যদি সে তাহাজ্জুদ (তাহাজ্জুদ-এর নফল নামায পড়া হয়, রাত দুপুরের পর ঘুম থেকে উঠে) নিয়মমত পড়তো (বুখারী)। যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর কানে এই কথা গিয়ে পৌছলো, তখন সেদিন থেকেই তিনি (রাঃ) বাকায়দা তাহাজ্জুদের নামায পড়া শুরু করে দিলেন। একইভাবে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি (সাঃ) রাত্রে তাঁর জামাতা হযরত আলী (রাঃ) এবং মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীতে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি তাহাজ্জুদ পড় ?' হযরত আলী বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! পড়বার চেষ্টা তো করি, কিন্তু যখন খোদাতা'লার ইচ্ছায় কোন কোন সময় আমাদের চোখ বন্ধই থেকে যায়, তখন তাহাজ্জুদ বাদ পড়ে যায়।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তাহাজ্জুদ পড়বে, ঠিক মত'। এই কথা বলে তিনি তাঁর ঘরের দিকে রওয়ানা হলেন, এবং পথিমধ্যে বার বার এই কথা আওড়াতে থাকলেন ঃ

وكان الانسان اكثر شئ جدلا

এই কথাটি কোরআন করীমের একটি আয়াত যার অর্থ হচ্ছে, মানুষ সব সময়ই তার ত্রুটি স্বীকার করতে ভয় পায়, এবং নানান অজুহাত দেখায় নিজের দোষ ঢাকবার জন্য। উদ্দেশ্য (এই আয়াত আওড়াবার) এটাই ছিল যে, হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর উচিত ছিল এই কথাই বলা যে, কখনও আমাদের বিচ্যুতি হয়ে যায়। কিন্তু সেকথা না বলে তাঁরা এই কথা কেন বললেন যে, যখন খোদাতা'লার ইচ্ছায় আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারি না এবং শুয়েই থাকি ? এবং এই কথা বলার মাধ্যমে তারা তো নিজেদের ত্রুটিকে আল্লাহ্র দিকেই আরোপ করলেন!

কিন্তু, আল্লাহ্তা'লার প্রতি এইরূপ ভালবাসা সত্ত্বেও, তিনি (সাঃ) লোক দেখানো এবাদত এবং কষ্টকর এবাদতের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর নীতি এটাই ছিল যে, খোদাতা'লা মানুষের মধ্যে যে সকল শক্তি (Faculty) সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেগুলির সঠিক ব্যবহারই হচ্ছে আসল এবাদত। চোখ থাকা অবস্থায় চোখ একদম বন্ধ করে রাখা কিংবা চোখ তুলে ফেলে দেওয়া এবাদত নয় বরং অপরাধ। তবে হ্যাঁ, চোখের খারাপ

ব্যবহার অবশ্যই পাপ। কান-এর শ্রবণ শক্তি যদি কোন অপারেশনের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলা হয়, তাহলে তা হবে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে শক্ত অপরাধ। তবে হ্যাঁ, অপরের নিন্দা-গীবত ও চোগলখুরী পরচর্চা শোনা পাপ। খানা-পিনা ছেড়ে দিলে তা হবে নিজের প্রতি নিপীড়ন এবং খোদার কাছে অপরাধ। তবে, খানা-পিনার মধ্যে মগ্ন হয়ে পড়া এবং অবৈধ ও অবাঞ্ছিত কিছু খাওয়াটা পাপ। এই গোটা বিষয়টিই একটি অতীব মহান শিক্ষা, যা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন দুনিয়ার সামনে। এবং যা তাঁর পূর্বে কোন নবীই পেশ করেন নি। স্বভাবজ শক্তিসমূহের সঠিক ব্যবহারের নাম উত্তম চরিত্র। স্বভাবজ শক্তি নষ্ট করে ফেলা নির্বুদ্ধিতা। এগুলিকে অবৈধ কাজে ব্যবহার করাই অপকর্ম। এগুলিকে যথার্থরূপে ব্যবহার করাই প্রকৃত পুণ্যকর্ম। এটাই হচ্ছে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিক্ষার সারমর্ম। এবং এটাই সারসংক্ষেপ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবন-চারিত্র্যের এবং তাঁর কর্মকান্ডেরও।

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন ঃ 'রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জিন্দেগীতে এমন কোন ঘটনা কখনই ঘটেনি যে, তাঁর সামনে যদি দু'টি উপায় খোলা থাকে, তাহলে এই দু'টির মধ্যে যে উপায়টি সহজ সরল সেটিকে তিনি অবলম্বন করেন নি। শর্ত থাকতো শুধু একটাই যে, সেই সহজ উপায়টি অবলম্বন করার মধ্যে যেন কোন প্রকার পাপ-এর আশংকা না থাকে। যদি পাপের কোন আশংকার অবকাশ থাকে তাহলে তিনি সেই উপায় থেকে সকল মানুষের চাইতে অধিক দুরত্বে চলে যেতেন। কতই না সুন্দর আকর্ষণীয় এবং কতই না উচ্চ স্তরের ও মর্যাদার ছিল সেই আচরণ ! (মুসলিম)

দুনিয়াকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য মানুষ কতভাবেই না অহেতুক নিজেই নিজেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলে, দুর্ভোগ-দুর্দশার মধ্যে ফেলে। এই যে মানুষ নিজে নিজেই দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে পড়ে, তা কখনই খোদাতা'লার জন্য ঘটে না। কেননা, খোদাতা'লার জন্যে তো বৃথা কোন কাজই কল্পনা করা যায় না। তাদের দুঃখ-কষ্টে এবং তকলিফের মধ্যে পড়াটা তাদের তরফে লোকদেরকে ধোঁকা দেওয়ার কারণেই ঘটে থাকে। তাদের প্রকৃত পুণ্য যেহেতু খুব কম থাকে, সেহেতু তারা ঐ সব মিথ্যে পুণ্য কর্মের দ্বারা লোকদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। এবং নিজেদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবার জন্য মানুষের চোখে ধূলো দেয়। কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য তো ছিল খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং প্রকৃত পুণ্যকাজ করা। তাঁর তো লোক দেখানো এবং বানোয়াটি পুণ্য কাজের কোন প্রয়োজন ছিল না। দুনিয়া যদি তাঁকে সৎ মনে করতো তাহলেও, কিংবা দুনিয়া যদি তাঁকে সৎ মনে না করতো তাহলেও, তা ছিল তাঁর জন্য একই কথা। (এতে তাঁর কিছু যেতোও না, আসতোও না)। তাঁর লক্ষ্য তো ছিল শুধু একটাই এবং তা হলো ; আমার খোদা আমাকে কী মনে করছেন, এবং আমার নিজের প্রাণের কাছে আমার অবস্থা কী ! খোদা এবং নিজের প্রাণের সাক্ষ্যের পর যদি মানুষেরাও সত্য সাক্ষ্য দিত, তাহলে তিনি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতেন। কিন্তু তারা যদি আড়-চোখে দেখতো, তাহলে তিনি তাদের দৃষ্টির অস্বচ্ছতার জন্য আফসোস করতেন। যদিও, তাদের মতামতের কোন তোয়াক্কা তিনি করতেন না।

নিজ বিবিগণের (রাঃ) প্রতি হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আচরণ

আপন বিবিগণের প্রতি তাঁর (সাঃ) আচরণ ছিল অতীব নম্র এবং ন্যায়-ভিত্তিক। কোন কোন সময় তাঁর স্ত্রীরা (রাঃ) তার প্রতি কঠোরতাও প্রদর্শন করতেন। কিন্তু, তিনি কিছু না বলে হেসেই উড়িয়ে দিতেন। একদিনে তিনি হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, এ্যায় আয়েশা ! যখন তুমি আমার প্রতি অভিমান কর, তখন আমি ঠিকই বুঝতে পারি যে, তুমি অভিমান করে আছ।' হযরত আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে আপনি তা বুঝতে পারেন ?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'যখন আমার উপরে খুশী থাক, আর কোন কারণে কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি সব সময়েই বলে যে, 'মুহাম্মদ-এর খোদার কসম, কথাটা এটাই। আর যখন তুমি আমার প্রতি নারাজ থাক এবং কসম খাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন তুমি বলে থাক, ইব্রাহীমের খোদার কসম, কথাটা এটাই'। এই কথা শুনে হযরত আয়েশা হেসে ওঠলেন এবং বললেন 'ঠিক কথা, আপনি ঠিকই ধরেছেন'।(বুখারী)

হযরত খাদিজা (রাঃ), যিনি ছিলেন তাঁর (সাঃ) বড় বিবি এবং যিনি তাঁর (সাঃ) জন্য বড় বড় কোরবানী করেছিলেন, তাঁর (রাঃ) ইন্তেকালের পরে আঁ-হযরত (সাঃ) কয়েকটি বিয়ে বা নেকাহ্ করেছিলেন। এই বিবিরা (রাঃ) থাকা সত্ত্বেও তিনি (সাঃ) কখনই হযরত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের কথা ভুলে যাননি। হযরত খাদিজার (রাঃ) বান্ধবীরা যখনই আসতেন তিনি (সাঃ) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। (মুসলিম)। হযরত খাদিজার (রাঃ) হাতের তৈরী কোন জিনিস যদি তাঁর (সাঃ) সামনে এসে যেত, তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠতো।

বদর-এর যুদ্ধে তাঁর (সাঃ) এক জামাতা যুদ্ধবন্দীরূপে এসেছিলেন। মুক্তিপণ পরিশোধ করার মত কোন সম্পদ তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মেয়ে যখন দেখলেন যে, স্বামীকে মুক্ত করে আনবার মত কোন সম্পদ তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি তাঁর মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে হারখানি তাঁর কাছে ছিল, সেই হারখানি তিনি তাঁর স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। সেই হারখানা যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে পেশ করা হলো, তখন তিনি সেই হার চিনতে পারলেন। তাঁর দু'চোখ ভরে অশ্রু এলো। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, 'আমি আপনাদেরকে হুকুম তো দিচ্ছি না, কেননা এইরূপ হুকুম দেওয়ার কোন অধিকার আমার নেই, কিন্তু আমি জানি যে, এই হারটি যয়নব-এর কাছে ছিল তার মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রূপে। যদি আপনারা খুশী মনে এটা করতে পারেন তো আমি সুপারিশ করছি, মেয়েকে তার মায়ের শেষ স্মৃতি চিহ্ন থেকে বঞ্চিত না করতে।" সাহাবারা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের জন্য এর চাইতে খুশীর বিষয় আর কি হতে পারে ?' তারা হারখানি হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। (হালবিয়া)

হযরত খাদিজার (রাঃ) কোরবানীসমূহের প্রভাব তাঁর (সাঃ) উপরে এত বেশী ছিল যে, তিনি (সাঃ) তাঁর অন্য বিবিদের (রাঃ) সামনে প্রায়শঃ তাঁর (রাঃ) কোন না কোন পুণ্যকাজের বর্ণনা করতেন। এভাবেই একদিন তিনি (সাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) সামনে হযরত খাদিজার (রাঃ) কোন নেকীর অর্থাৎ পুণ্যকাজের বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এতে হযরত আয়েশা খানিকটা গোশ্বা করেই বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনি ওই বুড়ীর স্মৃতিচারণ ছেড়ে দিন তো ! আল্লাহ্তা'লা আপনাকে তো তার চাইতে উত্তম জওয়ান ও সুন্দরী স্ত্রীদেরকে দিয়েছেন ? এক কথা শুনে আবেগে উত্তেজিত হয়ে ওঠলেন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তিনি বললেন, 'আয়েশা তুমি ধারণাই করতে পারবে না যে, খাদিজা আমার জন্য কী করেছে। (বুখারী)

উত্তম চারিত্র্য

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্বভাব ছিল অত্যন্ত সাদাসিদে। কখনই কোন দুঃখ কষ্টে তিনি ঘাবড়াতেন না। কখনো কোন আকাংখা সীমাতিরিক্ত আশান্বিত হতেন না। জীবনী গ্রন্থগুলোতে বলা হয়েছে যে, তাঁর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান এবং শৈশবেই তিনি মাকেও হারান। আট বছর পর্যন্ত তিনি তাঁর দাদার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর তিনি তাঁর চাচা আবু তালেব-এর অভিভাবকত্বে লালিত-পালিত হন। চাচার সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্ক তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পিতা মৃত্যুর সময় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বিশেষ করে ওসীয়্যতও করে গিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন এবং তাঁর প্রতি খেয়াল রাখতেন। কিন্তু চাচীর মধ্যে না ছিল তেমন স্নেহ মমতা, না বংশগত দায়িত্ববোধ। বাড়ীতে যখন কোন ভাল কিছু আনা হতো, তখন অনেক সময় তিনি তাঁর বাচ্চাদেরকেই আগে তা দিয়ে দিতেন এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কথা খেয়ালই করতেন না। আবু তালিব বাড়ীর ভেতরে এসে তাঁর ছোট্ট ভাতিজাটিকে কান্নাকাটি বা চিল্লাচিল্লী করতে দেখতেন না। বরং তিনি দেখতে পেতেন যে, তাঁর বাচ্চারা তো কিছু একটা খাচ্ছে, কিন্তু তাঁর সেই ছোট্ট ভাতিজাটি গুটিসুটি হয়ে এক পাশে বসে আছে। চাচার মমতা এবং খান্দানের দায়িত্ব ও জিম্মাদারী তাঁর সামনে ভেসে উঠতো। তিনি দৌড়ে গিয়ে তাঁর ভাতিজাকে কোলে তুলে নিতেন এবং বলতেন, 'আমার বাচ্চাটার দিকেও তো একটু খানি খেয়াল করো !' আমার বাচ্চাটার দিকেও তো একটু খানি খেয়াল করো।' এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। কিন্তু যারা দেখতো তারা বলেছে যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম না কখনো অভিযোগ অনুযোগ করতেন, না তাঁর চেহারাতে কোন বিষন্নতা প্রকাশ পেত ; না তাঁর চাচাতো ভাইদের সঙ্গে কোন মন কষাকষি হতো। বরং তাঁর জিন্দেগী এই সাক্ষ্যই দান করে যে, কীভাবে তিনি তাঁর পরিবর্তিত অবস্থায়, হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত জাফর (রাঃ)-এর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং কীভাবে তাঁদের উত্তম তরবীয়ত দান করেছিলেন, লালন-পালন করেছিলেন।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জিন্দেগী পার্থিব প্রেক্ষিতে বলতে কি, নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছে। জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান, এবং শৈশবকালেই মা ও দাদা একজনের পরে আর একজন মারা যান। তারপর, বিয়ে শাদী করলেন তো বাচ্চা-কাচ্চারাও একটার পর একটা মারা যেতে থাকলো। এরপর, কয়েকজন স্ত্রী-ও একের পর এক মারা গেলেন। এঁদের মধ্যে হযরত খাদিজা রাযি আল্লাহো আনহার মত প্রেমময়ী, স্বামী গতপ্রাণ, মহীয়সী মহিলাও ছিলেন। কিন্তু তিনি এই সমস্ত দুঃখ-বেদনাই খুশী মনেই বরদাস্ত করেছেন। এবং এই সকল ব্যথা-বেদনার ভারে না তিনি ভেঙ্গে পড়েছিলেন, না এতে তাঁর খোলা-মেজাজের প্রতি কোন প্রভাব পড়েছিল। চোখে তাঁর আহত হৃদয়ের ছাপ দেখা যেত না। প্রত্যেকের সামনে তিনি প্রফুল্লই থাকতেন। কদাচিৎ কোন উপলক্ষ্যে প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করতেন। একবার একজন স্ত্রীলোক - যার ছেলে মারা গিয়েছিল - সে তার ছেলের কবরের পাশে মাতম করছিল। রসূল করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন ঃ এ্যায়, মেয়ে লোক ! সবর করো, প্রত্যেককেই তো খোদার হুকুমে যেতে হবে। ঐ স্ত্রীলোকটি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে চিনতো না। সে জবাব দিল, 'যেভাবে আমার বাচ্চা মারা গেছে, সেভাবে তোমার বাচ্চাও যদি মারা যেত, তাহলেই বুঝতে পারতে সবর কাকে বলে।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কথা বলে ওখান থেকে চলে গেলেন,'একটা নয়, আমার তো সাত সাতটি বাচ্চা মারা গেছে।' (আবুদাউদ) এই ধরনের ঘটনার উপলক্ষ্যে কখনো কখনো শুধু এতটুকুই প্রকাশ করতেন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর অতীতের কোন দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে। এর দরুন, তাঁর মানবজাতির খেদমতের ক্ষেত্রে না কোন ভাটা পড়েছিল, না তাঁর চিত্তের প্রফুল্লতায় কিছু কমবেশী হয়েছিল।

সহিষ্ণুতা

সহিষ্ণুতা তাঁর (সাঃ) মধ্যে এত অধিক ছিল যে, খোদাতা'লা যে সময় তাঁকে রাজত্ব দান করলেন, সেই সময়কালেও তিনি প্রত্যেকটি লোকের কথা শুনতেন। কোন ব্যক্তি কঠোরতা প্রদর্শন করলেও তিনি চুপ করেই থাকতেন, কখনই কঠোরতার বিরুদ্ধে কাঠোরতা প্রদর্শন করতেন না।

মুসলমানরা তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার পরিবর্তে তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদা উল্লেখ করে ডাকতেন। অর্থাৎ তাঁরা ইয়া রসূলাল্লাহ্ বলে তাঁকে ডাকতেন। এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা, ইশ্ইয়ায়ী রীতি অনুযায়ী, তাঁর প্রতি শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকার পরিবর্তে 'আবুল কাসেম' বলে ডাকতো। (আবুল কাসেম অর্থ কাসেমের পিতা ; তাঁর এক পুত্রের নাম ছিল কাসেম) ।একবার এক ইহুদী মদীনায় এসে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে বাহাস শুরু করে দিল। বাহাসের মধ্যে সে বার বার বলছিল, এ্যায় মুহাম্মদ ! কথাটা তো এ রকম ! এ্যায় মুহাম্মদ ! কথাটা তো এ রকম !' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন ভ্রূক্ষেপ না করে তার কথার জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু, সাহাবারা (রাঃ) তার স্পর্ধা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন। শেষে, একজন সাহাবী আর সইতে পারলেন না। তিনি ঐ ইহুদীকে বললেন, 'খবরদার। তাঁর

(সাঃ) নাম ধরে কথা বলবে না। তুমি 'রসূললুল্লাহ' কইতে না পার তো কমসে কম 'আবুল কাসেম তো বলো!' ইহুদী লোকটি বললো, আমি তো সেই নামই নিচ্ছি, যা তাঁর বাপ-মা রেখেছে তার জন্য। রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং তাঁর সাহাবাকে বললেন, 'দেখো! এ ঠিকই বলছে, আমার বাপ-মা আমার নাম 'মুহাম্মদ'-ই রেখেছেন। যে নাম সে নিতে চাচ্ছে, নিতে দাও। ওর উপর রাগ করো না।'

তিনি (সাঃ) যখন কাজের উদ্দেশ্যে বাইরে রওয়ানা হতেন, তখন পথিমধ্যে লোকজন তাঁর পথ আগ্‌লিয়ে দাঁড়িয়ে যেত এবং তাদের নানান প্রয়োজনের কথা বলতে থাকতো। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তাদের প্রয়োজনের কথা বলা শেষ না করতো, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতেন। তাদের বক্তব্য শেষ হলে পর তিনি আবার রওয়ানা দিতেন। এমনিভাবে কোন কোন লোক মুসাফাহা করার সময়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর হাত ধরেই থাকতো। যদিও ব্যাপারটা অপসন্দনীয় বটে, এবং কাজেকর্মে বাধারও সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনই ওদের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে না, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মুসাফাহাকারী তাঁর হাত ধরেই থাকতো, ততক্ষণ তিনিও তাঁর হাত ঐ ব্যক্তির হাত থেকে সরায়ে নিতেন না। সব ধরনের অভাবী ও হাজতমন্দ ঠেকে পড়া ব্যক্তিরা তাঁর কাছে আসতো এবং তাদের প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলতো। কখনো কখনো তিনি কোন প্রার্থীকে তার প্রয়োজনমত কিছু দিয়ে দেওয়ার পরও যদি সে লোভের বশে আরও কিছু চাইতো তাহলে তিনি আবারও কিছু তাকে দিকে দিতেন। এবং তার ইচ্ছা পূরণ করতেন। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, লোকেরা বার বার চাইতে এসেছে, এবং তিনি প্রত্যেক বারই তাদেরকে কিছু না কিছু দান করেছেন।

যে ব্যক্তিকে তাঁর বিশেষ করে মোখলেস বা সৎলোক বলে মনে হতো তাকে তার চাওয়া জিনিষ দিয়ে দেওয়ার পরে তাকে তিনি স্রেফ এতটুকুই বলতেন যে, কতই না ভাল হতো যদি তুমি খোদার উপরেই তাওয়াক্কুল রাখতে, ভরসা করতে। এমনিভাবে, একজন মোখলেস – নিষ্ঠাবান সাহাবী একের পর এক দাবী করে তাঁর কাছে কয়েকবার তার প্রয়োজনের কথা বলে টাকা-পয়সা চেয়েছিল। তিনি (সাঃ) তার খায়েশ বা যাচ্ঞা তো পূরণ করে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শেষে বলে দিয়েছিলেন যে, সর্বাপেক্ষা উত্তম অবস্থা তো সেটাই যে, মানুষ যেন খোদার উপরেই ভরসা করে। এই সাহাবার মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল, এবং শিষ্টাচারও ছিল, যা কিছু সে নিয়েছিল আদরের খাতিরে সে তা ফেরৎ দেয় নি। কিন্তু, আগামীর জন্য সে আবেদন করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! এটাই আমার শেষ কথা, আগামীতে আমি আর কারো কাছে কোন অবস্থানেই কিছু চাইব না।' একবার এক যুদ্ধ হচ্ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ংকর অবস্থা বিরাজ করছিল। নেজা বল্লম নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তরবারি খটাখট্ শব্দ হচ্ছিল। ঘাড়ে ঘাড়ে ধাক্কা লাগছিল। সিপাহীর উপরে সিপাহী ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে উক্ত সাহাবীর হাত থেকে, যখন তিনি শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কোড়াটি পড়ে যায়। পাশের একজন পদাতিক সৈন্য মনে করলো যে, অফিসারটি যদি (ঘোড়া থেকে) নেমে পড়েন তাহলে তাঁর ভীষণ ক্ষতি হতে পারে। তাই, সে ছোঁ মেরে কোড়াটি উঠিয়ে তাঁর হাতে দিতে চেষ্টা করছিল। ঐ সাহাবীর নজর উক্ত সিপাহীর উপরে পড়লো। তিনি বললেন, 'হে আমার ভাই !

তোমাকে আল্লাহর কসম ! তুমি ঐ কোড়াতে হাত লাগাবে না।' এই কথা বলতে বলতে তিনি ঘোড়ার উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন এবং কোড়াটি উঠিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর ঐ সাথীকে বললেন, 'আমি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম যে, আমি কারো কাছেই কোন সাহায্য চাইব না। আমি যদি তোমাকে কোড়াটি উঠাতে দিতাম, যদিও আমি তোমার কোন সাহায্য চাইনি, তবু বর্তমান পরিস্থিতিতে এটাকে নিঃসন্দেহে চাওয়াই বলা যেত – তাহলে এটা করাতে আমি ওয়াদা ভঙ্গকারী হতে যেতাম। যদিও এটা যুদ্ধের ময়দান, তথাপি আমার কাজ আমিই করবো।

ইনসাফ বা সুবিচার

ইনসাফ ও আদল – সুবিচার ও ন্যায়পরতা – তাঁর (সাঃ) মধ্যে এত বেশী ছিল যে, তার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। আরবে স্বজনপ্রীতি এবং সুপারিশ গ্রহণ করা ছিল এক প্রকার সাধারণ বা সংক্রামক ব্যাধি। আরবের কথা তো আছেই, সে যুগেই সুসভ্য দেশগুলিতেও দেখা যেত যে, বড় বড় লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপার সবাই ইতস্ততঃ করতো, ভয় পেত ; কিন্তু গরীবদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কেউ ভয় পেত না। একবার এক মকদ্দমা এলো তাঁর (সাঃ) কাছে। এক খুব বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলা এক অপর লোকের জিনিষ নিয়ে গিয়েছিল (চুরি করেছিল), যখন বিষয়টা জানা জানি হয়ে গেল, তখন আরবদের মধ্যে দারুন টেন্‌শান ও উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। কেননা, এতে করে অনেক বড় সম্মানিত এক খান্দানের বেইজ্জতী হয়ে যাবে। তারা চাইলো যে, তারা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এই দরখাস্ত পেশ করবে, যেন ঐ মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কেউ অবশ্য সাহস পেল না। তবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক স্নেহের পাত্র আসামা বিন যায়েদকে (রাঃ) লোকেরা খুব করে ধরলো, যেন তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে ঐ মহিলার জন্যে সুপারিশ করেন। আসামা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে কথাটা পাড়তে না পাড়তেই তাঁর (সাঃ) চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন ফুটে ওঠলো, এবং তিনি বললেন, আসমা ! তুমি এটা কী বলছো ! অতীতের জাতিগুলি তো এ জন্যই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তারা বড় লোকদের খাতির করতো এবং গরীবদের প্রতি যুলুম করতো। ইসলামতো এসবের কোন অনুমতি দেয় না। এবং আমি তো এটা কোনমতেই করতে পারব না। আল্লাহ্‌র কসম ! যদি আমার মেয়ে ফাতেমাও এ ধরনের অপরাধ করতো, তাহলে তাকেও আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়তাম না। (বুখারী)

এই ঘটনাও ইতোপূর্বে তাঁর জীবনী (নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা-সাঃ) গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বদর-এর যুদ্ধে যখন হযরত আব্বাস (সাঃ) বন্দী হয়ে এসেছিলেন এবং বন্দী অবস্থায় কষ্টে কাৎরাচ্ছিলেন, তখন তিনিও (সাঃ) মনে মনে দারুন কষ্ট পাচ্ছিলেন। সাহাবারা তাঁর এই মনোকষ্ট লক্ষ্য করে যখন হযরত আব্বাসের (রাঃ) হাতের বাঁধন খুলে দিলেন এবং বিষয়টা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, আমার আত্মীয় যেমন অন্যদের আত্মীয়রাও তেমনি। হয় তোমরা আমার চাচা আব্বাসকে পুনরায় রশি দিয়ে বাঁধো, নয়তো সকল বন্দীদের বাঁধন খুলে দাও।'

সাহাবাদের (রাঃ) যেহেতু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মনোকষ্টের কারণ অনুভব করতে পেরেছিলেন, সেহেতু তাঁরা বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমরা কড়া পাহারা লাগাব । কাজেই আমরা সমস্ত বন্দীর বাঁধন খুলে দিচ্ছি।' অতঃপর প্রতেকটি বন্দীর বাঁধন তাঁরা খুলে দিলেন।

তিনি (সাঃ) যুদ্ধের সময়েও সুবিচার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন খবরা-খবর সংগ্রহের জন্য। শত্রুপক্ষের কিছু লোকের সঙ্গে তাঁরা মুখোমুখী হলেন পবিত্র মাসের (রজব-এর) শেষ তারিখে। সাহাবারা মনে করলেন যে, আমরা যদি এদেরকে জীবিত ছেড়ে দেই তাহলে এরা ফিরে গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে খবর দিবে, এবং আমরা মারা পড়বো। কাজেই তাঁরা (রাঃ) ওদের উপরে হামলা চালালো। ফলে, তাদের মধ্যে একজন এই যুদ্ধে মারা গেল। যখন এই খবর সংগ্রহকারী কাফেলাটি মদীনা ফিরে এলো, তখন তাদের পিছে পিছে মক্কাবাসীদের তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল এই অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো যে, এরা পবিত্র মাসের মধ্যে আমাদের দুজন মানুষকে হত্যা করেছে। অথচ, এই লোকগুলোই সব পবিত্র মাসের মধ্যেও সব সময় রসূলুলল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপরে অত্যাচার চালিয়েছিল। কাজেই, তাদের তো এই জবাবই পাওয়ার কথা যে, তোমরা কবে পবিত্র মাসের সম্মান দেখিয়েছ যে, তোমরা আমাদের কাছে সেই সম্মানের দাবী করছ ? কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই জবাব দিলেন না, বরং বললেন, 'হা বেইনসাফী হয়ে গেছে। কেননা, এটা সম্ভব যে, ওরা হয়তো মনে করেছিল যে, ওরা পবিত্র মাসের মধ্যে আক্রান্ত হবে না। কাজেই, ওরা হয়তো আত্মরক্ষার তেমন চেষ্টাও করেনি। ফলে, রক্তপাতের ঘটনা ঘটে গেছে।' যাহোক, তিনি (সাঃ) আরবের প্রথা অনুযায়ী সেই হত্যার জন্য রক্তপণ আদায় করে দিলেন ওদের উত্তরাধিকারীদের কাছে।

আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা

সবাই আপনজনদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু, তিনি (সাঃ) অন্যদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন। একবার এক ইহুদী তাঁর কাছে এলো এবং অভিযোগ করে বললো, 'দেখুন! আবুবকর কীভাবে আমার মনে আঘাত দিলো। সে বললো কিনা, আমি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কসম খেয়ে বলছি যে, খোদাতা'লা তাঁকে (সাঃ) মূসার চাইতে বড় করে বানিয়েছেন। তার একথা শুনে আমি প্রাণে বড়ই আঘাত পেয়েছি।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবূবকরকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেমন কথা . . . ? হযরত আবূবকর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! ঐ লোকটাই তো আগে শুরু করেছে। এবং বলেছে যে, আমি মূসার (আঃ) কসম খেয়ে বলছি যে, তাঁকে খোদাতা'লা সারা জগতের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তখন আমি বলেছি যে, আমি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কসম খেয়ে বলছি যে, তাঁকে খোদাতা'লা মুসার চাইতে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন'। তিনি (সাঃ) তখন বললেন, এমনটা করা উচিত না। অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান দেখানোই উচিত। আমাকে মূসার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিবে না। (বুখারী ; ১ম খন্ড ; কিতাবুল

আম্বিয়া) এর অর্থ অবশ্য এটা ছিল না যে, তিনি (সাঃ) নিজেকে মূসার (আঃ) চাইতে শ্রেষ্ঠ জানতেন না। বরং এর অর্থ এটাই ছিল যে, এই কথাটি বলাতে অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খোদাতা'লা মূসার চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন বলাতে ইহুদীরা মনে কষ্ট পায়। (কাজেই, কথাটা তাদের কাছে এভাবে না বলাই ভাল)।

গরীবদের প্রতি খেয়াল এবং তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান

আঁ-হযরত (সাঃ) সব সময়ে গরীবদের অবস্থা ভাল করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেন এবং সমাজে তাদেরকে উপযুক্ত স্থানে বসাবার জন্য নিরলস চেষ্টা চালাতেন। একবার তিনি একখানে বসে ছিলেন। একজন ধনীলোক তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেল। তিনি একজন সাহাবীর কাছে জানতে চাইলেন, 'লোকটা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।' তিনি (রাঃ) বললেন, লোকটি সম্মানী ও ধনীলোকদের একজন। সে যদি কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তাহলে তার সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়। এবং সে যদি কোন সুপারিশ করে, তাহলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।' এইকথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম চুপ হয়ে থাকলেন। এরপর আর এক ব্যক্তি সেখান দিয়ে চলে গেল। এই ব্যক্তিটি মনে হলো গরীব ও নগণ্য লোক। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথীকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'এই লোকটি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী ?' তিনি (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! এ একজন গরীব লোক। এ যদি কারো মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে এর আবেদন গ্রাহ্য হবে না। এ যদি কোন ব্যাপারে সুপারিশ করে, তাহলে এর সুপারিশ গৃহীত হবে না। এমনকি এ যদি কারো সাথে কথা বলতে চায়, তাহলে তার কথাও কেউ শুনতে চাইবে না।' এই কথা শুনে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এই গরীব মানুষটির মূল্য, সারাটা জগতকে সোনা দিয়ে ভরে দেওয়ার চাইতেও অধিক।' (বুখারী, কিতাবুর রিফাক)। একজন গরীব স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়া-মোছার কাজ করতো। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কয়েকদিন তাকে দেখতে পেলেন না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'স্ত্রীলোকটিকে কয়েকদিন যাবৎ দেখতে পাচ্ছি না কেন ?' লোকেরা বললো যে, 'সে তো মারা গেছে।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'সে মারা গেছে, অথচ তোমরা আমাকে খবর দাও নি ?' আমিও তো তার নামাযে জানাযায় শামিল হতে পারতাম।' আরও বললেন, 'হতে পারে, গরীব বলে তোমরা তাকে হেয় মনে করতে। এটা তো ঠিক নয়। তোমরা আমাকে বলো, ওর কবর কোথায়।' তারপর, তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। (বুখারী কিতাবুস্ সালাত)।

তিনি (সাঃ) প্রায়ই বলতেন, 'অনেক লোক এমন আছে যে, তাদের মাথার চুলে জট ধরা, শরীরে ধূলো মাটি ভরা। তারা যদি লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়, তো লোকেরা তাদের দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু, এই সব (গরীব ও অসহায়) লোক যদি আল্লাহতা'লার নামে কসম খেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহ্তা'লার কাছে তাদের সম্মান এত বেশী যে, তিনি তাদের কসম পূর্ণ করেই ছাড়েন।' (মুসলিম, খন্ড ২)

একবার, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কয়েকজন গরীব সাহাবী (সাঃ) যাঁরা এক সময় গোলাম ছিলেন, একত্রে বসে ছিলেন। আবূ সুফিয়ানকে তাদের সামনে দিয়ে যেতে দেখে ওঁরা তার কাছে ইসলামের বিজয় সম্পর্কে কিছু বললেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁদের কথা শুনছিলেন, তাঁর কানে কথাগুলো খারাপ লাগলো। কেননা, এতে করে কোরেশদের নেতাকে হেয় করা হয়েছে। তিনি ঐ লোকদেরকে সম্বাধন করে বললেন, 'তোমরা তো কোরেশদের সর্দার এবং তাদের শাসনকর্তাকে হেয় প্রতিপন্ন করছ।' পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কথাটা অভিযোগের আকারে উত্থাপন করলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এ্যায়, আবু বকর ! হতে পারে, তুমি আল্লাহতা'লার ঐ খাস বান্দাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তা-ই হয়, তাহলে মনে রাখবে, তোমার আল্লাহ্ও তোমার প্রতি নারাজ হয়ে যাবেন।' হযরত আবূবকর তৎক্ষণাৎ উঠলেন, এবং উঠে ঐ লোকদের কাছে চলে গেলেন, এবং বললেন, 'হে আমার ভাইয়েরা! তোমরা কি আমার কথায় নারাজ হয়েছে ?' এতে, ঐ গোলামরা জবাব দিলেন, 'হে আমাদের ভাই ! আমরা নারাজ হই নি। খোদা আপনার ভুল ক্ষমা করুন !' (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

কিন্তু, যখনই তিনি (সাঃ) গরীবদের ইজ্জত ও মান-সম্মান কায়েম করতেন এবং তাদের প্রয়োজন মিটাতেন, তখনই তিনি তাদেরকে আবার আত্মসম্মান বোধেরও শিক্ষা দিতেন। এবং কারো অনুগ্রহের ভিখারী হতে মানা করতেন। তাই, তিনি সব সময়ে বলতেন যে, দরিদ্র বা মিসকীন সে নয়, যাকে একটা বা দু'টো খেজুর দিয়ে, কিংবা এক লোকমা বা দু'লোকমা খাবার দিয়ে তৃপ্ত করা হয় বা তছল্লী দেওয়া হয়। মিসকীন হচ্ছে সে, যে নিদারুন কষ্টের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও কিছু চায় না। (বুখারী)

তিনি তাঁর জামা'তকে এই উপদেশও সব সময় দান করতেন যে, সেই দাওয়াত নিকৃষ্ট দাওয়াত, যেখানে গরীবদেরকে ডাকা হয় না। (বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেছেন, 'একবার একজন গরীব স্ত্রীলোক আমার কাছে এলেন। তার সাথে তাঁর দু'টি মেয়েও ছিল। ঐ সময়ে আমাদের ঘরে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি ঐ খেজুরই ওদেরকে দিয়ে দিলাম। সেই খেজুরটি সে আধাআধি করে মেয়ে দু'টিকে খাওয়ালো এবং উঠে চলে গেল। যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে এলেন, তখন আমি তাঁকে ঘটনাটি বললাম। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, যে গরীবের ঘরে মেয়ে আছে এবং সে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, খোদাতা'লা তাকে কেয়ামতের দিকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাবেন। আরও বললেন, আল্লাহতা'লা ঐ স্ত্রীলোকটিকে তার ঐ কাজের জন্য জান্নাতের হকদার বানাবেন।' (মুসলিম, খ. ২, কিতাবুল ফাযায়েল)

একবার তিনি (সাঃ) জানতে পারলেন যে, তাঁর এক সাহাবী সায়াদ (সাঃ), যিনি ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি (রাঃ) অন্যান্যদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছিলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সে কথা শুনতে পেয়ে তাঁকে বলেছিলেন, তোমার এই শক্তি ও সামর্থ্য এবং তোমার এই মাল-সম্পদ তুমি তোমার বাহুবলেই কি

লাভ করেছ ? না, তা কখ্খনো হতে পারে না। তোমার গোত্রীয় ক্ষমতা এবং তোমার মাল-সম্পত্তি সব গরীবদের মাধ্যমেই আসে।

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্ ! আমাকে মিসকীন অবস্থায় জীবিত রাখো, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দিও, এবং মিসকীনদের সঙ্গী করেই আমাকে কেয়ামতের দিনে উঠাইও। (তিরমিযী, খ. ২, আবওয়াব আল-জুহদ)।

একদিন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাজারের দিকে গিয়েছিলেন। বাজারের নিকটে তাঁর একজন গরীব সাহাবী (রাঃ), যিনি দেখতেও খুব কুশ্রী ছিলেন, প্রচন্ড গরমের মধ্যে বোঝা বহন করে করে একদিক থেকে আর একদিকে ফিরছিলেন। একে তো তাঁর চেহারা ছিল কুশ্রী, তাতে আবার গরমের মধ্যে ঘামে আর ধূলোবালিতে তাঁকে একেবারে কিম্ভূতকীমাকার দেখাচ্ছিল। ঠিক সেই সময়ে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাজার থেকে ফিরে এলেন এবং দেখলেন যে, ঐ সাহাবীর অবস্থা একদম যাচ্ছে তা-ই হয়ে গেছে। তিনি (সাঃ) চুপে চুপে তাঁর (রাঃ) পিছনে চলে গেলেন, এবং বাচ্চারা যেমন লুকোচুরি খেলতে গিয়ে একজন আর একজনের পিছন থেকে চোখ চেপে ধরে, এবং বলে, বল তো কে ? ঠিক তেমনিভাবে তিনিও (সাঃ) তাঁর (রাঃ) চোখে হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। ঐ সাহাবী পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁর (সাঃ) বাজু ও শরীরে ডলামলা করতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যক্তি নিশ্চয় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন যে, এত গরীব, এত কুৎসিৎ এবং এত জঘন্য অবস্থার এক লোকের প্রতি এত স্নেহ এত মমতা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ দেখাতে পারেন না। তিনি এটা বুঝেই যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামই তাঁর (রাঃ) প্রতি স্নেহ মহব্বত দেখাচ্ছেন, তিনি তাঁর (রাঃ) ধূলো মাটি, ময়লা আর ঘামে ভরা দেহটাকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড়ে-চোপড়ে ঘষাঘষি করা শুরু করে দিলেন, যেন তিনি (রাঃ) দেখতে চান যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভালবাসা এবং তাঁর (সাঃ) আকর্ষণ কতটা গভীর ! রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুচকি মুচকি হাসছিলেন এবং তাঁকে এইরূপ করতে বারণও করছিলেন না। যখন তিনি (রাঃ) তাঁর পিঠের সমস্ত ময়লা দিয়ে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কাপড়-চোপড় সব নোংরা করে ফেললেন, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মশ্করা করে বলতে লাগলেন, 'আমার কাছে একজন গোলাম আছে, কোন খরিদ্দার আছে কি ? তাঁর (সাঃ) এই উক্তি তাঁকে (রাঃ) যেন আকাশ থেকে মাটিতে নিক্ষেপ করলো। এবং তিনি (রাঃ) ভাবতে থাকলেন যে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কে আছে এমন যে, সে তার প্রতি কোন প্রকার সম্মানের দৃষ্টিতে তাকাতে পারে ? আর আমার যোগ্যতাই বা কী যে, লোকে আমাকে গোলাম হিসেবে কিনে নিবে ! তিনি (রাঃ) হতাশার সুরে বললেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ ! পৃথিবীতে আমার খরিদ্দার তো কেউ নেই।' রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'না, না, এমন কথা বলো না, তোমার মূল্য খোদাতা'লার দৃষ্টিতে অনেক বড়'। (মিশকাত)।

তিনি (সাঃ) নিজেই যে কেবল গরীব-দুঃখীদের খেয়াল রাখতেন তা নয়, বরং তিনি তাঁর জামাতের সবাইকে গরীব-দুখী মানুষের প্রতি খেয়াল রাখার জন্য সব সময় উপদেশ

দিতেন। হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তখনই কোন অভাবী মানুষ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে আসতো যখনই তিনি উপস্থিত সবাইকে বলতেন, আপনারাও এর ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করুন, যাতে করে আপনারা একটা ভাল কাজে সুপারিশ পেশ করার পুণ্যে অংশীদার হতে পারেন।'

(বুখারী, খ, ১, কিতাবুজ্ জামাত)।

এইভাবে তিনি একদিকে তো জামাতের লোকজনদের মনে গরীবদেরকে সাহায্য করবার প্রেরণা সঞ্চার করতেন অপরদিকে সাহায্য প্রার্থীদের মনেও অন্যান্য মুসলমানদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির প্রয়াস পেতেন।

গরীবের মাল সম্পত্তির সংরক্ষণ

ইসলামের বিজয়ের পর রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে প্রচুর মাল-সম্পদ আসতো, যেগুলিকে তিনি হকদার বা প্রাপকদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতেন। একবার বিপুল মাল-সম্পদ এলো। তাঁর মেয়ে ফাতেমা রাযি আল্লাহো আনহা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! দেখুন, যাঁতা ঘুরাতে ঘুরাতে আমার হাত জখম হয়ে গেছে। আপনি যদি এই সব মাল-সম্পত্তি থেকে আমাকে একটা বান্দী বা একটা গোলাম দিতেন, তাহলে আমার হাত দুটো কিছুটা রেহাই পেত।' তিনি বললেন, 'ফাতেমা, বেটী আমার! আমি তোমাকে বান্দী বা গোলাম রাখার চাইতে অধিক মূল্যবান জিনিষের কথা বলছি, যখন তুমি শুইতে যাও তখন তেত্রিশ বার **'আল্হামদো লিল্লাহ্'** তেত্রিশ বার **সোবহানাল্লাহ্'**-এবং চৌত্রিশ বার **আল্লাহো আকবর'** পড়বে। এটাই হবে তোমার জন্য বান্দী বা গোলাম রাখার চাইতে উত্তম।

-(বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত)

একবার কিছু মাল-মাত্তা এলো। তিনি সেগুলো বাঁটোয়ারা করে দিলেন। বাঁটোয়ারা করার সময় একটা দীনার তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। এবং সেটা গড়াতে গড়াতে একটা কিছুর আড়ালে গিয়ে থামলো। মাল বন্টন করতে করতে তিনি ঐ দীনারটার কথা ভুলে গেলেন। সব মাল বন্টন করা শেষ হয়ে গেলে পর, তিনি মসজিদে এলেন এবং নামায পড়ালেন। নামায পড়ানোর পরে যিকরে ইলাহীতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে, যেমনটা তাঁর অভ্যাস ছিল ; কিংবা যেমনটা লোকদেরকে তাদের প্রয়োজনের কথা বলতে বা মস্লা মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে দিতেন – সে সব কিছুই না করে তিনি খুব দ্রুত তাঁর ঘরের দিকে চলে গেলেন। এমন দ্রুততার সঙ্গে গেলেন যে, কোন কোন সাহাবী বলেছেন যে, তিনি আমাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে টপ্কিয়ে টপ্কিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। গিয়ে সেই দীনারটির তালাশ করলেন। তারপর বাইরে ফিরে এলেন। এসে দীনারটি হকদার কোন ব্যক্তিকে দিতে দিতে বললেন, 'এই দীনারটা পড়ে গিয়েছিল এবং আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। নামায পড়াবার সময় আমার মনে পড়লো। আমার মন এই ভেবে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠলো যে, যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, আর লোকের এই মাল আমার ঘরেই পড়ে থাকে, তাহলে আমি খোদার কাছে কী জবাব দিব। এজন্যই আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে গেলাম এবং এই মাল খুঁজে বের করে আনলাম।' -(বুখারী কিতাবুল কসুফ)

এর চাইতেও বড় কথা হচ্ছে, তিনি (সাঃ) সদ্‌কার মাল তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য হারাম করে গেছেন। পরে যাতে এমন না হয় যে, তাঁর মর্যাদা এবং মান-সম্মানের খাতিরে সদ্‌কার মাল-সম্পদ লোকেরা তাঁর সন্তান-সন্ততির মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দেয় এবং অন্যান্য গরীবরা বঞ্চিত থেকে যায়। একবার তাঁর সামনে সদকার কিছু খেজুর আনা হলো। তাঁর নাতি হযরত ইমাম হাসান রাযি আল্লাহ আন্‌হু, যিনি তাঁর পাশেই বসা ছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দু-আড়াই বছর, তিনি (রাঃ) একটা খেজুর তুলে মুখে দিলেন। যেই না মুখে দেওয়া, আর অমনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর (রাঃ) মুখের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে খেজুরটা বের করে আনলেন। এবং বললেন, 'এটা আমাদের হক্ নয়, এটা আল্লাহ্‌র গরীব বান্দাদের হক্।'

–(বুখারী, কিতাবুল কসুফ)

গোলাম বা দাসদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার

গোলামদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করার জন্য তিনি (সাঃ) সর্বদাই আদেশ-উপদেশ দিতেন। তাঁর এই নির্দেশ ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির কাছে কোন গোলাম থাকে, এবং উক্ত গোলামকে আযাদ বা স্বাধীন করে দেওয়ার তৌফীক বা সামর্থ্য যদি, তার না থাকে, এবং সে যদি কখনো ক্রোধের বশে সেই গোলামকে মারধোর করে কিংবা গালি দেয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, ঐ গোলামকে আযাদ করে দেওয়া (মুসলিম, খ. ২, কিতাবুল ঈমান)।

(একইভাবে, তিনি গোলামদেরকে স্বাধীন করে দেওয়ার জন্য এত জোর দিতেন যে, সর্বদাই বলতেন 'যে ব্যক্তি কোন গোলামকে আযাদ করে দেয় আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ঐ গোলামের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বদলায় তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দিবেন।')

তিনি আরও বলতেন যে, একজন গোলামকে ঠিক ততটুকু কাজই করাবে যতটুকু কাজ করতে সে সক্ষম। আর যখন তার দ্বারা কোন কাজ করাবে তখন তার সঙ্গে সেই কাজে নিজেও অংশ গ্রহণ করবে, যাতে করে সে নিজেকে হেয় মনে না করে।

–(মুসলিম, খ. ২, কিতাবুল ঈমান)

তিনি (সাঃ) বলতেন যে, যখন সফর কর তখন, হয় তোমার গোলামকে সওয়ারীর (উট, ঘোড়া ইত্যাদির) উপরে নিজের সাথে বসাবে, নয়তো তার সাথে বার নির্দিষ্ট করে (একবার তুমি আর একবার সে) সওয়ারীর উপরে চড়ে বসবে। গোলামদের ব্যাপারে তিনি এত তাকিদ করতেন যে, এত বেশী জোর দিতেন যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ), যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর সব সময়েই তাঁর (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে কাটাতেন এবং এই শিক্ষার কথা প্রায়ই শুনতেন, তিনি বলেছেন, 'ঐ খোদার কসম ! যার হাতে আবু হোরায়রার জীবন, – যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার কোন সুযোগ আমি না পেতাম, এবং হজ্জ করার তৌফীক আমার না হতো, এবং আমার বুড়ী মা জীবিত না থাকতেন, যার খেদমত করা আমার জন্য ফরয, তাহলে আমি এই আকাংখাই করতাম যে, আমি যেন গোলাম-এর অবস্থায় মারা যাই। কেননা, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম

গোলামের অধিকারের ব্যাপারে সব সময়ে অত্যন্ত উত্তম নির্দেশ দান করতেন। (প্রাগুক্ত)।

মা'রুর বিন সুয়াইদ (রাঃ) বলেছেন, 'আমি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত আবূ জর গিফারী (রাঃ)-কে দেখেছি যে, তাঁর কাপড়-চোপড় যেমন, ঠিক একই রকম কাপড়-চোপড় তাঁর গোলামেরও। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আপনার নিজের কাপড় এবং আপনার গোলামের কাপড় একই রকম কেন ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি একবার রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যামানায়, এক ব্যক্তিকে তার মা তুলে খোঁটা দিয়েছিলাম তার মা ছিল একজন বান্দী। এতে রসূলে করীম সাল্লাল্লহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমিতো এমন এক ব্যক্তি যার মধ্যে এখনও কুফরীর গন্ধ রয়ে গেছে। গোলাম কি ? সে তো তোমারই ভাই এবং তোমার ক্ষমতার উৎস, মাধ্যম ! খোদাতা'লার কোন হিকমতের কারণে সে কিছুদিনের জন্য তোমার কব্জায় এসে গেছে বা এসে যায়। সুতরাং, এটাই তো হওয়া উচিত যে, যার ভাই তার খেদমতের জন্য আসে, সে নিজে যা খাবে তাকেও তা-ই খাওয়াবে, সে নিজে যা পরবে, তাকেও তা-ই পরাবে। এবং তোমাদের কেউ যেন গোলামের দ্বারা এমন কোন কাজ না করায়, যে-কাজ করার শক্তি তার নেই। আর, যখন তুমি তাকে কোন কাজ করতে দিবে, নিজেও সেই কাজ তার সঙ্গে মিলে একত্রে করবে।' -(মুসলিম, খ. ২, কিতাবুল ঈমান)

একইভাবে তিনি (সাঃ) এই নির্দেশও দিতেন যে, যখন তোমার চাকর তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসে, তখন তাকেও সঙ্গে বসিয়ে কিছু না কিছু খাদ্য তাকেও অবশ্যই খাওয়াবে। কেননা, ঐ খাদ্য রান্না করে সে তার অধিকার কায়েম করেছে। (প্রাগুক্ত)।

মানব-সেবায় আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

আঁ হযরত (সাঃ) বিশেষভাবে সেই সমস্ত ব্যক্তির প্রতিও খেয়াল রাখতেন যারা মানব জাতির সেবায় নিজেদের সময় অতিবাহিত করেছেন। একবার তাঈ গোত্রের লোকেরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাদের কিছু সংখ্যক লোক বন্দী হয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে আরবের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেম-এর এক মেয়েও ছিল। যখন সে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে বললো যে, সে হাতেম তাঈ-এর এর মেয়ে, তখন তার সঙ্গে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সঙ্গে ব্যবহার করলেন, এবং তাঁর সুপারিশক্রমে তার গোত্রের শাস্তি ক্ষমা করে দিলেন। (সিরাত হালবিয়া, খ. ৩, পৃঃ. ২২৭)

নারী জাতির প্রতি উত্তম আচরণ

নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের ব্যাপারে তিনি (সাঃ) বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে নারীর উত্তরাধিকার কায়েম করেছেন। বস্তুতঃ কোরআন করীমের মধ্যেই ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত

করে দেওয়া আছে। একইভাবে মায়েদেরকে এবং বিবিদেরকে বেটীদের এবং স্বামীদের সম্পত্তির এবং বিশেষ অবস্থায় বোনদেরকে ভাইদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর বুকে আর কোন ধর্মই এইভাবে নারীদের অধিকার কায়েম করেনি।

একইভাবে তিনি (সাঃ) নারীকে তার সম্পদের নিরংকুশ মালিকানা দান করেছেন। স্বামীর এই অধিকার নেই যে, স্বামী হওয়ার কারণে সে তার স্ত্রীর সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করবে। নারী তার সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে পূর্ণ এখ্‌তিয়ার রাখে।

নারীর প্রতি উত্তম ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) এত বেশী সজাগ ও সতর্ক ছিলেন যে, আরবরা যেহেতু এ ব্যাপারে আদৌ অভ্যস্ত ছিল না, যেহেতু তারা এ সব দেখে ধোঁকা খেতো এবং মানিয়ে নিতে অসুবিধায় পড়তো। হযরত ওমর (রাজিঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমার স্ত্রী কখনো কখনো আমার কথার মধ্যে নাক গলাতো। আমি তাকে ধমক দিতাম এবং বলতাম, আরবের লোকেরা কোনকালেই স্ত্রী লোকদের এই অধিকার মেনে নেয় নি যে, তারা পুরুষদের কাজে-কর্মে পরামর্শ দিবে। এতে আমার স্ত্রী আমাকে বলতো- যাও, স্বয়ং মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিবিরা তাঁকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন, কই ! তিনি (সাঃ) তো কখনো তাঁদেরকে বাধা দেন না ! তাহলে, তুমি কেন এ কথা বলছো ?' এতে আমি (হযরত ওমর) তাকে বলতাম, 'আয়েশা রাযি আল্লাহো আনহা তো হচ্ছেন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয় মানুষ, তাঁর কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু হতো যদি তোমার মেয়ে (হাফসা-রাঃ), আর সে যদি ঐ রকম করতো, তাহলে অবশ্যই একদিন না একদিন তাকে তার অপরাধের শাস্তি পেতে হতো।' একবার কোন কথার দরুন রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিছু দিন তিনি ঘরের বাইরে থাকবেন এবং বিবিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন না। আমি (হযরত ওমর) যখন খবরটা পেলাম তখন বললাম, 'দেখো ! আমি যা বলেছি, তা-ই ঘটেছে, পরে আমি আমার মেয়ে হাফসার ঘরে গেলাম, দেখলাম সে কাঁদছে। বললাম, 'হাফ্‌সা কি হয়েছে ? রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তোমাকে তালাক দিয়েছে না কি ?' সে বললো, 'তা তো আমি জানি না। কিন্তু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন কারণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তিনি কিছু দিনের জন্য ঘরে আসবেন না।'

আমি বললাম, 'হাফসা ! আমি না তোমাকে প্রথম থেকেই বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, তুমি আয়েশার (রাঃ) নকল করতে যেওনা! কেননা আয়েশা তো হচ্ছে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিশেষ প্রিয়পাত্রী। দেখো ! আখেরে তুমি সেই মসীবতের মধ্যেই পড়েছ, যার ভয় আমি করতাম।' এই কথা বলে আমি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে গেলাম। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটা মোটা শক্ত চাটাইয়ের উপরে শুয়ে ছিলেন। শরীরে কোন জামা ছিল না। তাঁর গায়ে চাটায়ের দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর পার্শ্বে বসলাম এবং বললাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! এই যে কিস্‌রা এবং কায়সার (পারস্যের এবং রোমের সম্রাট) তাদের কী হক্ আছে যে, তারা খোদাতা'লার নেয়ামত (পুরস্কার) লাভ করে ! তবু তারা তো কত সুখে জিন্দেগী অতিবাহিত করছে ! আর, খোদাতা'লার রসূলের এই কষ্ট !'

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা ঠিক না। ও ধরনের জীবন আল্লাহ্‌র রসূলদের জন্যে নয়। ও তো দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের রীতি।' যা হোক, আমি তাঁকে সেই পুরো ঘটনাটাই বললাম যা ঘটেছিল আমার বিবিকে ও বেটীকে নিয়ে। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার কথা শুনে হেসে ওঠলেন, এবং বললেন, 'এ কথা ঠিক নয় যে, আমি আমার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছি। আমি তো স্রেফ একটা মসলেহাত-এর কারণে (অর্থাৎ এটাই ভাল হবে মনে করে) কিছুদিন ঘরের বাইরে থাকবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। –(বুখারী, কিতাবুন্ নিকাহ্)

স্ত্রীলোকদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি ও তিনি (সাঃ) যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। একবার নামায পড়ার সময় একটা বাচ্চার কান্না শুনতে পেলেন। এবং সেই কারণে তিনি তাড়াতাড়ি করে নামায পড়ানো শেষ করলেন। পরে বললেন, 'একটা বাচ্চা কাঁদছিল, আমার মনে হলো, ওর মায়ের মনে নিশ্চয় কষ্ট হচ্ছে। কাজেই, আমি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলাম যাতে করে বাচ্চাটার মা ওর খবর নিতে পারে।' (বুখারী, কিতাবুস্ সালাত) যখন তিনি এরূপ কোন সফরে যেতেন যখন মহিলারাও সঙ্গে থাকতেন, তখন সব সময়ে ধীরে ধীরে চলতে বলতেন। একবার এই রকম এক অবস্থায় যখন সৈনিকেরা তাদের ঘোড়া ও উটগুলিকে লাগাম ঢিলা করে দিয়ে জোরে তাড়া করতে শুরু করলো, তখন তিনি বললেন, আরে করছ কি তোমরা ! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো ! কাঁচের প্রতি খেয়াল রেখো!' অর্থাৎ, করছ কি ! মেয়েরা ও তো সঙ্গে আছে। তোমরা যদি এভাবেই উট দাবড়াতে থাকো তাহলে তো ঐ কাঁচগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

– (বুখারী, কিতাবুল্ আদাব)

একবার এক যুদ্ধের ময়দানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে উট ও ঘোড়াগুলোকে কিছুতেই বাগে রাখা যাচ্ছিল না। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। অনেক মহিলাও পড়ে গিয়েছিলেন। একজন সাহাবা, যাঁর উট ছিল রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে, তিনি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পড়ে যেতে দেখে বিচলিত হয়ে ওঠলেন, এবং লাফ দিয়ে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি যেন আপনার বদলে মারা যাই।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের পা তখনও রেকাবের মধ্যে আটকেছিল এবং তিনি ঝুলে থাকার অবস্থায় ছিলেন। তিনি (সাঃ) তাড়াতাড়ি পা ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেকে মুক্ত করলেন এবং ঐ সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে ছাড়ো, ঐদিকে, মেয়েদের দিকে যাও।'

যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি সকল মুসলমানদেরকে একত্রে সমবেত করে যে সব ওসীয়্যত করেছিলেন, তার মধ্যে একটা কথা ছিল, 'আমি তোমাদেরকে আমার শেষ ওসীয়্যত (Will) এই করছি যে,নারীদের সঙ্গে যেন সব সময় উত্তম আচরণ করা হয়। তিনি একথাও প্রায়ই বলতেন যে, যার ঘরে মেয়েরা আছে এবং সে তাদের লেখাপড়া শিখায়, এবং ভালভাবে তরবীয়ত করে (প্রশিক্ষণ দেয়), খোদাতা'লা কেয়ামতের দিনে তার জন্য দোযখ হারাম করে দিবেন।' (তিরমিযী, খ. ২)

সাধারণ আরবীদের মধ্যে এই রকম একটা রেওয়াজ ছিল যে, স্ত্রীলোকেরা যদি কোন ভুল-চুক করতো তাহলে তাদেরকে মারপিট করা হতো। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, তখন তিনি বললেন, 'স্ত্রীলোকেরা খোদাতা'লার বান্দী, তোমাদের নয়। তাদেরকে কখনই মারধোর করবে না।' কিন্তু, স্ত্রীলোকদের যেহেতু, তখনও পর্যন্ত সঠিক তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণ হয়ে ওঠেনি, তাই তারা সাহসী হয়ে ওঠলো এবং পুরুষদের মোকাবেলা শুরু করে দিলেন। ফলে, ঘরে ঘরে বিশৃংখলা শুরু হতে লাগলো। শেষে, হযরত ওমর (রাঃ) রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ উত্থাপন করলেন, 'আপনি তো আমাদেরকে স্ত্রীদেরকে মারপিট করতে নিষেধ করেছেন, ফলে তারা এখন দারুন অবাধ্য হয়ে ওঠছে। এমতাবস্থায়, আমাদেরকে এই অনুমতি দেওয়া উচিত যে, আমরা ওদেরকে মারপিট করেত পারবো।' যেহেতু, তখনও পর্যন্ত স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আদেশ-নিষেধ নাযিল হয় নি, সেহেতু রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন যে, যদি কোন স্ত্রীলোক সীমালংঘন্ করে তাহলে তোমরা তোমাদের প্রথা অনুযায়ী তাকে মারধোর করতে পারবে। ফল এই দাঁড়াল যে, পুরুষরা বিনা ব্যতিক্রমে তাদের স্ত্রীদের মারপিট করা শুরু করে দিল এবং আবারও একবার সেই পুরাতন আরবী প্রথা জারি হয়ে গেল। এতে স্ত্রীলোকেরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামের বিবিদের নিকটে এসে অভিযোগ করলে তিনি (সাঃ) তাঁর সাহাবাদেরকে বললেন, 'যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না, কিংবা তাকে মারধোর করে, তার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে, সে খোদার দৃষ্টিতে সৎ বলে বিবেচিত হবে না'। এর পরে রীতিমত নারীর অধিকার কায়েম হয়, এবং নারীরা মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মেহেরবানীতে এই প্রথমবারের মত স্বাধীনতার শ্বাস গ্রহণ করতে পারলো। (আবূ দাউদ, কিতাবুন্ নিকাহ)।

মাবিয়া আল্ কুশায়বি বলছেন, 'আমি রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! আমাদের উপরে স্ত্রীদের অধিকার কী ? তিনি বললেন, 'খোদা তোমাকে যা খেতে দিয়েছেন, তা তুমি তাকে খেতে দাও, খোদা তোমাকে যা পরতে দিয়েছেন তা তুমি তাকে পরতে দাও, এবং তাকে থাপ্পড়ও মেরো না, গালিও দিও না। এবং তাকে ঘর থেকে বের করেও দিও না।' (প্রাগুক্ত)।

তিনি (সাঃ) স্ত্রীলোকদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি এতটা খেয়াল রাখতেন যে, তিনি সর্বদাই নসীহত করতেন যে, যারা বাইরে সফরে যায়, তাদের উচিত শীঘ্র শীঘ্র ঘরে ফেরা, যাতে তাদের বাল্-বাচ্চাদের কষ্ট না হয়। বস্তুতঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি সফরে গিয়ে তার সেই সব প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে, যার জন্য তাকে সফরে যেতে হয়েছিল, তখন তার উচিত নিজের আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করে জল্দি জল্দি ফিরে আসা। (বুখারী ও মুসলিম)।

রসূলে পাক (সাঃ)-এর নিজের একটা রীতি ছিল এই যে, যখন তিনি কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন তিনি দিনের বেলায় শহরে প্রবেশ করতেন। যদি রাত্রি হয়ে যেত, তাহলে শহরের বাইরেই তাঁবু খাটাতেন এবং ভোর হয়ে গেলে পরে শহরে প্রবেশ করতেন। এবং সব সময় তিনি সাহাবাদেরকে (রাঃ) বলতেন যে, তারা যেন হঠাৎ করে ঘরে ফিরে ঘরের লোকজনকে বা আত্মীয়-স্বজনকে বিব্রত না করে। (আবূ দাউদ) এর

মধ্যে তাঁর (সাঃ) দৃষ্টিতে এই হেকমত নিহিত ছিল যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আবেগের। স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী যদি তার নিজের দেহের এবং পোষাক-আশাকের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি পূরা খেয়াল না রেখে থাকে, এবং স্বামী অকস্মাৎ ঘরে এসে যায়, তাহলে এই আশংকা দেখা দিতে পারে যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার যে আবেগ থাকে তা ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং, তিনি (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যে, লোকেরা যখনই সফর থেকে ফিরবে, দিনের বেলায় এসে ঘরে প্রবেশ করবে। এবং প্রথমেই বিবি-বাচ্চাদেরকে খবর দিবে যে,, যাতে করে তারা তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে।

মৃতব্যক্তিদের প্রতি আচরণ

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সব সময়ে এই উপদেশ দিতেন যে, মারা যাওয়ার পূর্বে প্রত্যেকের উচিত ওসীয়্যত (will) করে যাওয়া, যাতে করে তার আত্মীয়-স্বজনেরা তার পরে অসুবিধায় না পড়ে।

মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তাঁর এই নসীহতও ছিল যে, যখন শহরে কোন ব্যক্তি মারা যায়, তখন লোকেরা যেন কখনই তার কোন খারাপীর কথা বলে না বেড়ায়, বরং তার ভাল কথাই বর্ণনা করা উচিত। কেননা, তার খারাপীর কথা বর্ণনা করার মধ্যে কোন মঙ্গল নিহিত নেই। বরং, তার পুণ্যের বর্ণনার মধ্যে এই মঙ্গল রয়েছে যে, তার জন্য মানুষের মনে দোয়া করবার ইচ্ছে জাগবে। (বুখারী, কিতাবুল জামায়াত)।

তিনি এই বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতেন যে, কোন ব্যক্তি মারা গেলে অতি শীঘ্র যেন তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। বস্তুতঃ, যদি এমন কোন ব্যক্তি মারা যায় যার ঋণ থাকে তাহলে, হয় তিনি নিজেই তার ঋণ পরিশোধ করে দিতেন, নয়তো যদি এটা তার সামর্থ্যে না কুলাতো, তাহলে ঐ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে তার ঋণ পরিশোধ করে দিতে বলতেন। এবং **ঐ ব্যক্তির নামাযে জানাযা ততক্ষণ পর্যন্ত পড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ঋণ শোধ করা হতো।**

প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার

প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনি (সাঃ) অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, 'জিব্রাইল (আঃ)আমাকে বার বার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার মনে হতো, পাছে না আবার প্রতিবেশীদেরকেও উত্তরাধিকার করা হয়'। (বুখারী, খ. ২, কিতাবুল আদব)।

হযরত আবূ জর (রাঃ) বলেছেন, আমাকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন 'এ্যায় আবূ জর ! যখন কোন সূরুয়া রান্না করবে, তখন পানি বেশী করে দিবে। এবং নিজের প্রতিবেশীদের প্রতিও খেয়াল রাখবে।' (মুসলিম, খ. ২)। এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, অন্যান্য জিনিষ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং, আরবরা তো ছিল যাযাবর এবং তাদের সবচেয়ে উপাদেয় খাদ্য ছিল সূরুয়া (স্যূপ)। তিনি প্রতিবেশীদের প্রতি খেয়াল রাখার কথা বলার মধ্য দিয়ে যা বলতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে, শুধু মজা বা স্বাদের দিকেই খেয়াল রেখো না, বরং ঐ দিকটাও খেয়াল রেখো যাতে তোমার প্রতিবেশীরা তোমার খানার মধ্যে শরীক হতে পারে।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কসম। সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মুমিন নয় ! আল্লাহ্‌র কসম, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় মুমিন নয় ! আল্লাহর কসম, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় নয়।' সাহাবারা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! কোন ব্যক্তি মুমিন নয় ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যার প্রতিবেশী তার ক্ষতিকারিতা ও খারাপ আচরণ থেকে রক্ষিত নয়।' (বুখারী কিতাবুল্ আদাব)

নারীদেরকেও তিনি নসীহত করতেন, 'নিজেদের প্রতিবেশীদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখো'।একবার তিনি স্ত্রীলোকদের মধ্যে ওয়াজ করছিলেন। বললেন, যদি বকরীর একটা পাওয়াও (পায়ের নীচের অংশ) থাকে কারো কাছে, তবে সেটার মধ্যেও হাম্‌ছায়া বা প্রতিবেশীর হ্‌ক রয়েছে।' (বুখারী, খ. ২)

তিনি হামেশাই সাহাবাদের নসীহত করতেন যে, যদি তোমাদের প্রতিবেশী তোমাদের দেওয়ালে কোন শিক গেড়ে দেয় বা কিংবা তোমার দেওয়াল থেকে এমন কোন সুবিধা নেয় যাতে তোমার কোন অসুবিধা বা ক্ষতি না হয় তাহলে তাকে বাধা দিও না।' (মুসলিম, খ. ২)।

হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে তার হাম্‌ছায়াকে দুঃখ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে তার মেহমানকে দুঃখ দিতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, সে হয় ভাল কথা বলবে, নয়তো চুপ করে থাকবে।' (মুসলিম, খ. ১)।

পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার

পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রায় লোক যখন সাবালক হয়ে যায় বিয়ে-শাদী করে, তখন বিবি-বাচ্চার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যায়। ফলে, পিতা-মাতার প্রতি উত্তম আচরণ দেখানোর ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখাতে থাকে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই দুর্বলতা দূর করার জন্য মা-বাপের সঙ্গে উত্তম আচরণ করার গুরুত্ব বার বার বিস্তারিত- ভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে এলো এবং বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমার উত্তম আচরণের সর্বাপেক্ষা বড় হকদার বা অধিকারী কে ?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তোমার মা।' ঐ ব্যক্তি বললো, 'তারপর' আঁ হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তারপর তোমার মা।' ঐ ব্যক্তি আবার বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! তারপর কে ?' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তারপরেও তোমার মা।' লোকটি চতুর্থ বারের মত প্রশ্ন করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ তারও পরে ?' তখন তিনি বললেন, তারপরে তোমার বাপ এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়-স্বজন এবং বাদবাকী আত্মীয়-স্বজন।' (বুখারী, কিতাবুল্ আদাব)।

রসূলে করীম সাল্লল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিজের মুরব্বী-স্বজন তো তাঁর বাল্যকালেই মারা গেছেন। তাঁর বিবিদের মুরব্বী-স্বজনরা বেঁচে ছিলেন। এবং তিনি তাঁদের প্রতি হামেশা সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি (সাঃ) যখন একজন বিজয়ী সেনাপতি হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন হযরত আবু বকর

(রাঃ) তাঁর পিতাকে আঁহুযূর (সাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে এলেন। ঐ সময় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরকে বললেন, 'আপনি কেন তাঁকে কষ্ট দিলেন, আমিই তো তাঁর কাছে যেতে পারতাম।' (হালবিয়া)

আঁ হযরত (সাঃ) সব সময় তাঁর সাহাবাদেরকে (রাঃ) বলতেন, 'যে ব্যক্তি বৃদ্ধ পিতামাতাকে পেয়েছে, কিন্তু জান্নাতের অধিকারী হতে পারেনি, সে বড়ই হতভাগ্য।' অর্থাৎ বৃদ্ধ বাপ-মায়ের সেবা মানুষকে আল্লাহতা'লার কৃপার এত বড় উত্তরাধিকারী করে যে, যে ব্যক্তি তার বাপ-মায়ের সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করে, সে অবশ্যই পুণ্য অর্জনকারী হয়, এবং আল্লাহ্তা'লার কৃপার অধিকারী হয়ে যায়। (মুসলিম, খ. ২)

একবার, এক ব্যক্তি রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে অভিযোগ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমার আত্মীয়-স্বজনরা এমন যে, আমি তো ওদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু ওরা আমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে ; আমি ওদের উপকার করি, কিন্তু ওরা আমার উপরে যুলুম করে ; আমি ওদের সঙ্গে স্নেহ-ভালবাসার সঙ্গে আচরণ করি তো ওরা আমার সঙ্গে অশিষ্ট আচরণ করে।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার কথা যদি ঠিক হয়, তাহলে তো তোমার কপাল খুবই ভাল। কেননা, এতে তুমি সর্বদাই খোদার সাহায্য লাভ করবে।' (মুসলিম, খ. ২)

একবার, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর একজন সাহাবী – আবূ তালহা আনসারী (রাঃ) এলেন এবং তাঁর একটি বাগান তিনি দান করার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করলেন ! এতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হলেন এবং বললেন, 'বড় উত্তম সদ্কা ! বড় উত্তম দান।' আরও বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তো এটা ওয়াক্ফ করেই দিলে, এখন আমার মন চাচ্ছে যে, তুমি এটা তোমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই বাঁটোয়ারা করে দাও।' (বুখারী, খ, ২)

একবার, এক ব্যক্তি তাঁর (সাঃ) নিকটে এলো এবং বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার কাছে হিজরত করার বয়াত (অঙ্গীকার) করছি, এবং আপনার কাছে খোদার রাস্তায় জিহাদ করার জন্যেও বয়াত করছি। কেননা, আমি চাই যে, আমার খোদা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তোমার কি বাপ-মা কেউ বেঁচে আছেন ? লোকটি বললো, 'দুজনেই জীবিত।' তিনি (সাঃ) বললেন, 'তুমি কি সত্যিই চাও যে, খোদা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হোন ? সে বললো, 'হাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ্ !' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এটাই উত্তম যে, তুমি ফিরে যাও, এবং তোমার বাপ-মায়ের খেদমত করো। এবং ভালভাবে খেদমত করো।' (বুখারী)।

তিনি (সাঃ) সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, উত্তম আচরণ করার ক্ষেত্রে ধর্মের কোন প্রশ্ন নেই। গরীব আত্মীয়-স্বজন, তা সে যে কোন ধর্মেরই হোক, তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা পুণ্যের কাজ। হযরত আবূবকর (রাঃ)-এর একজন স্ত্রী ছিলেন পৌত্তলিক। হযরত আবূ বকরের মেয়ে হযরত আসমা (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি কি ওর সঙ্গে ভাল আচরণ করতে পারব ? তিনি (সাঃ) বলেছিলেন, 'অবশ্যই, সে তো তোমার মা ! তুমি অবশ্যই তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।' (বুখারী)

আত্মীয়-স্বজন তো বটেই, তিনি (সাঃ) আত্মীয়-স্বজনদের আত্মীয়-স্বজন এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। যখনই তিনি কোন পশু কোরবানী করতেন, তখনই হযরত খাদীজার (রাঃ) বান্ধবীদের বাড়ীতেও গোশ্ত পাঠাতেন। এবং সব সময়েই বলতেন, 'খাদীজার বান্ধবীদের কথা ভুলে যেও না, তাদের বাড়ীতে অবশ্যই গোশ্ত পাঠাবে।' (বুখারী)

একবার, হযরত খাদীজার (রাঃ) মৃত্যুর কয়েক বছর পরে, আঁ হযরত (সাঃ) একটি মজলিসে বসা ছিলেন, এমন সময় হযরত খাদীজার বোন হযরত হালাহ্ (রাঃ) তাঁর (সাঃ) সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এবং দরজার বাইরে খাড়া হয়ে বললেন, 'ভিতরে আসতে পারি ?' হালাহ্ (রাঃ) -এর কণ্ঠস্বর হযরত খাদীজার (রাঃ) কণ্ঠস্বরের মতই ছিল। সেই কণ্ঠস্বর শুনেই রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সালামের শরীরে কাপন শুরু হয়ে গেল। তিনি (সাঃ) নিজেকে শামলিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'হে আমার খোদা ! এ তো খাদীজার বোন হালাহ্।' (বুখারী)। বস্তুতঃ খাঁটি ভালবাসার স্বরূপ এটাই যে, যার সঙ্গে ভালবাসা থাকে, সৌজন্য থাকে, তার প্রিয়জনদের প্রতি এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত যারা তাদের প্রতিও ভালবাসা ও সৌজন্যবোধ সৃষ্টি হয়ে যায়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেছেন, 'একবার আমি সফরে ছিলাম। জরীর বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) নামক অপর একজন সাহাবীও ঐ সফরে আমার সঙ্গী ছিলেন। তিনি সফরে চাকরের মত আমার কামকাজ করতেন। জরীর (রাঃ) বয়সে বড় ছিলেন। তাই, আনাস (রাঃ) তাঁর সঙ্গে আদব রক্ষা করে চলাটা জরুরী মনে করতেন। এজন্যই, তিনি তাঁকে মানা করতেন, 'আপনি এসব করবেন না।' আমার মানা করাতে জরী (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি আনসারদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সীমাহীন খেদমত করতেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সালামের প্রতি তাঁদের এই ভালবাসা দেখে আমি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে, যখনই কোন আনসারীর সঙ্গে আমার সফর করার সুযোগ মিলবে, কিংবা তাঁর সঙ্গে থাকবার সুযোগ মিলবে, আমি তাঁর খেদমত করবো। কাজেই, আপনি আমাকে নিষেধ করবেন না, আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করছি।' (বুখারী ও মুসলিম)।

এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, নিজের ভালবাসার পাত্রের সেবাকারীর প্রতিও মানুষের ভালবাসা জন্মে। অতএব, যে সব মানুষের মনে তাদের মা-বাপের জন্য প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকে, তারা তাদের মা-বাপ ছাড়াও তাঁদের আত্মীয় -স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল থাকে।

একবার, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের এক বৈঠকে আত্মীয়-স্বজনদের সেবা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'উত্তম পুণ্য কাজ হচ্ছে, মানুষের উচিত তার পিতার বন্ধু-বান্ধবদের প্রতিও খেয়াল রাখা।' এই কথা তিনি বলেছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর কাছে। এবং তিনি এর উপরে আমলও করেছিলেন। একবার তিনি হজ্জে যাওয়ার সময় রাস্তায় একজন লোককে দেখতে পেলেন এবং তাঁকে তাঁর বাহন গাধাটি তিনি দিয়ে দিলেন এবং নিজের সুন্দর পাগড়ীটিও দিয়ে দিলেন। তাঁর (রাঃ) সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, 'আপনি এটা একটা কি কাজ করলেন ! লোকটা তো যাযাবর ! সামান্য কিছু দিলেই সে খুশী হয়ে যেত !' আব্দুল্লাহ বিন ওমর

(রাঃ) বললেন, 'এই লোকটির পিতা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। এবং আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সৎকর্মের উন্নত স্তরের পরিচয় এটাই যে, মানুষ তার পিতার বন্ধুদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে।' (মুসলিম, খ, ২)।

সৎ-সঙ্গ

আঁ হযরত (রাঃ) হামেশা এটাই পসন্দ করতেন যে, তাঁর আশেপাশে সব সময় সৎ-লোকেরাই থাকুক। যদি কখনও কারো মধ্যে কোন দুর্বলতা দেখতে পেতেন, তাহলে তিনি তাঁকে একাকী ভদ্রভাবে উপদেশ দিতেন। হযরত আবূ মুসা আশ্‌রারী (রাঃ) বলেছেন, 'রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন যে, সৎ বন্ধু ও সৎ মজলিস এবং অসৎ বন্ধু ও অসৎ মজলিসের উপমা হচ্ছে, যেমন ধরো, এক ব্যক্তি মুশ্‌ক (আতর) নিয়ে যাচ্ছে, সে যদি নিজে তা মাখে, তা হলে ফায়দা পাবে, যদি বিক্রী করে তা হলেও লাভবান হবে, কিম্বা কিছুই না করে শুধু কাছেই রাখে তাহলেও সুঘ্রাণ পাবে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির সঙ্গী-সাথীরা বদ বা অসৎ তার উপমা হচ্ছে, সেই ব্যক্তি, যে ভাটির আগুনে ফুঁ দেয়। তার জন্য এই আশংকা খুব স্বাভাবিক যে, আগুনের একটা ফুল্‌কি উড়ে এসে তার গায়ে পড়বে এবং তার কাপড়-চোপড় পুড়ে যাবে, কিংবা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধে তার মেজাজই খারাপ হয়ে যাবে।' (মুসলিম)

তিনি (সাঃ)সর্বদা তাঁর সাথীদেরকে সব সময় বলতেন, 'মানুষের চরিত্র বা আখলাক সেই রকমই হয়, যে রকম মজলিসে বা সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সে ওঠাবসা করে। কাজেই, সব সময় সৎ-সঙ্গ রাখবার চেষ্টা করবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের ঈমান-এর প্রতি খেয়াল

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন যে, কোন ব্যক্তি যেন ধোঁকা না খায়। একদিন রসূলে করীম সল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন, তাঁর একজন বিবি হযরত সাফিয়া বিন্‌তে হাঈ (রাঃ) তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন, কথা বলতে বলতে অনেক সময় কেটে গেল। তখন তিনি (সাঃ) মনে করলেন যে, তাঁকে (রাঃ) বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসা উচিত। যখন তিনি (সাঃ) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন তখন রাস্তার মধ্যে দুই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এদের সম্পর্কে আঁ হুযূর (সাঃ)-এর মনে এই ধারণার উদ্রেক হলো যে, এদের মনে পাছে আবার এইরূপ কোন কুধারনা বা ওছওয়াছার সৃষ্টি না হয় যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রি বেলায় এ কোন মহিলাকে সাথে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোক দুজনকে থামালেন এবং বললেন, 'দেখ ! এ আমার স্ত্রী সাফিয়া।' তারা বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার প্রতি আমাদের মনে অমূলক কুধারণার সৃষ্টি হতে পারে কীভাবে ? আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় দৌড়ায়, আমার ভয় হয়েছিল, পাছে না তোমাদের ঈমানের মধ্যে কোন ধোঁকা লাগে।' (বুখারী, খন্ড ১, কিতাবুস্ সওম)

অপরের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে যদি কারও কোন দোষ-ত্রুটি ধরা পড়তো, তাহলে তিনি তা ছাপিয়ে রাখতেন। আর যদি কেউ নিজেই নিজের দোষ প্রকাশ করতো, তাহলে তিনি তাকে নিষেধ করতেন দোষ প্রকাশ করতে। তিনি বলতেন যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি পৃথিবীতে তাঁর অপর কোন বান্দার পাপ ঢেকে রাখে, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা কিয়ামতের দিন তার পাপ ছাপিয়ে রাখবেন। (মুসলিম, খ, ২)

আঁ হযরত (সাঃ) একথাও বলতেন, আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ মুছে যেতে পারে (তওবার মাধ্যমে), কিন্তু যে নিজের পাপ নিজেই প্রকাশ করে তার কোন চিকিৎসা নেই।' তিনি আরও বলতেন, পাপ প্রকাশ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, কেউ রাতের বেলায় কোন পাপ করে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তার সেই পাপ ঢেকে রাখেন, কিন্তু সকাল বেলা যে তার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলে বলে দেয় যে, এ্যায় অমুক ! আমি না আজ রাতে এই কাজ করেছি। রাত্রে খোদা তার যে পাপের উপরে পর্দা করে রেখেছিলেন, সকালে সে তার সেই পাপকে নিজেই নাংগা করে দিল। (বুখারী, খ, ২ কিতাবুল্ আদাব)

অনেকে অজ্ঞতার দরুন মনে করে যে, পাপের কথা প্রকাশ করলে অনুতাপ করা হয়, তওবা করা হয়। কিন্তু, প্রকৃত তত্ত্ব হচ্ছে, পাপ প্রকাশ করলেই তওবা হয়ে যায় না। পাপের প্রকাশ নির্লজ্জতাকেই বৃদ্ধি করে। গোনাহ্ বা পাপ যদিও খারাপ কাজ, কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহ্ করে এবং সেজন্য মনে মনে লজ্জিত হয় ও নিজেকে তিরস্কার করে, তার জন্য তওবার রাস্তা খোলাই থাকে। এবং তাকওয়া বা খোদা-ভীরুতাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হতে থাকে। কোন না কোন এমন উত্তম সুযোগ সৃষ্টি হয়ে যায় যখন তাক্‌ওয়া জয়লাভ করে এবং গোনাহ্ দূরে পলায়ন করে। কিন্তু, যে ব্যক্তি নিজের পাপসমূহ নিজেই প্রকাশ করে, প্রচার করে এবং সে নিয়ে গর্ববোধ করে তার হৃদয় থেকে পাপবোধ মুছে যায়। আর যখন পাপবোধই মুছে যায়, তখন তো আর অনুতাপ তওবার কোন প্রশ্নই থাকে না।

একবার, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি যিনা (ব্যভিচার) করে ফেলেছি।' ব্যভিচার ইসলামে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত যেখানে কার্যকর থাকে সেখানে অনুরূপ ব্যক্তিকে যার ব্যভিচার ইসলামী আইনানুযায়ী প্রমাণিত হবে, তাকে দৈহিক শাস্তি প্রদান করতে হবে। যখন ঐ লোকটি বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আমি যিনা করেছি।' তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং অন্যদিকে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে থাকলেন। এর দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোকটিকে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, তোমার যে পাপের উপরে খোদা পর্দা করে দিয়েছেন, তার চিকিৎসা হচ্ছে তওবা-অনুতাপ। তার চিকিৎসা ঘোষণা দেওয়া নয়। কিন্তু লোকটি বিষয়টা বুঝতে পারলো না এবং সে মনে করলো যে, হয়তো রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার কথা শুনতে পাননি। এবং যেদিকে আঁ হযরত (সাঃ) মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন সেদিকে গিয়ে তাঁর সামনে খাড়া হয়ে গেল। এবং সে আবার বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি যিনা করেছি।' আবার তিনি (সাঃ) অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এবারও লোকটা বুঝতে পারলো না, এবং সে আবারও তাঁর (সাঃ) সামনে গিয়ে তার কথার পুনরুক্তি করলো। রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবারেও তার কথায় কর্ণপাত না করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবারও লোকটা তাঁর সামনে এসে খাড়া হলো এবং চতুর্থবারের মত তার কথা বললো। তখন, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি তো চাচ্ছিলাম যে, সে তার পাপের কথা প্রকাশ না করুক, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তাকে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু, সে চার চার বার তার নিজের নফসের বিরুদ্ধে নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছে। কাজেই আমি এখন লাচার।' (তিরমিযী, খ, ১)

অতঃপর তিনি (সাঃ) বললেন, 'এই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ উত্থাপন করেছে। সে ঐ স্ত্রীলোকটির বিরুদ্ধে অপরাধের কোন অভিযোগ উত্থাপন করছে না, যার সঙ্গে সে যিনা করেছে বলে বলছে। সেই স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখো, সে যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কিছু বলো না। এবং কেবল এই ব্যক্তিকেই তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী শাস্তি দাও। আর যদি, ঐ স্ত্রীলোকটিও স্বীকার করে, তবে তাকেও শাস্তি দাও।'

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটা রীতি ছিল যে, যে বিষয়গুলি সম্পর্কে কোরআনের শিক্ষা (তখনও পর্যন্ত) নাযিল হয়নি, সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে তিনি (সাঃ) তৌরাতের শিক্ষা অনুসরণ করে চলতেন। তৌরাতের আদেশ মোতাবেক ব্যভিচারীর জন্য হুকুম হচ্ছে 'ছঙ্গেছার' করা (প্রস্তর খন্ড ছুঁড়ে ছুঁড়ে হত্যা করা)। কাজেই, তিনি ঐ লোকটিকেও ছঙ্গেছার করে হত্যা করার হুকুম দিলেন। যখন লোকেরা তার উপরে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করে দিলেন, তখন সে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু, লোকেরা দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললো এবং তৌরাতের শিক্ষা মোতাবেক তাকে হত্যা করে ফেললো। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ব্যাপারটা জানতে পারলেন, তখন তিনি তা অপসন্দ করলেন। এবং বললেন, 'তার শাস্তি তো তার নিজেরই স্বীকারোক্তি অনুযায়ীই দেওয়া হয়েছিল। যখন সে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন তো সেই স্বীকারোক্তি সে প্রত্যাহার করেই পালিয়ে যাচ্ছিল। কাজেই, তোমাদের আর কোন অধিকার ছিল না যে, তারপরেও তোমরা তাকে ছঙ্গেছার করো। তাকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত ছিল।'আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সব সময় হুকুম দিতেন যে, শরীয়তের ঘোষণা প্রকাশ্য হতে হবে। একবার কিছুসংখ্যক সাহাবী এক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় একজন মুশরেকের (পৌত্তলিক) সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়, যে এদিক সেদিক জংগলে লুকিয়ে থাকতো। এবং যখনই কোন মুসলমানকে একলা পেত, তখনই তার উপরে হামলা চালিয়ে তাকে হত্যা করতো। উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) তার পিছু অনুসরণ করলেন এবং সুযোগ বুঝে তাকে ধরে ফেললেন। এবং তাকে হত্যা করার জন্য তরবারি উঠালেন। যখন সে (পৌত্তলিক) দেখলো যে, সে কাবু হয়ে পড়েছে তখন সে বললো ; 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই), – এর মাধ্যমে সে এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে একজন মুসলিম। কিন্তু, উসামা (রাঃ) তার সেই কথার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না এবং তাকে হত্যা করলেন। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ঐ যুদ্ধের খবর দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি মদীনায় পৌঁছলো। সে যুদ্ধের সব খবরা-খবর দেওয়ার সময় ঐ ঘটনার কথাও বর্ণনা করলো। এতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম উসামা (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি ঐ লোকটিকে হত্যা করেছ?' তিনি (রাঃ) বললেন, 'হাঁ। আঁ হযরত

(সাঃ) বললেন, 'কেয়ামতের দিনে তুমি কি করবে ? যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে ? অর্থাৎ খোদাতা'লার পক্ষ থেকে এই প্রশ্ন করা হবে যে, যখন ঐ ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলেছিল, তখন তুমি কেন তাকে হত্যা করেছিলে ? সে যদিও হত্যাকারী ছিল, কিন্তু সে তো তওবাও করেছিল। হযরত উসামা (রাঃ) জবাব দিতে গিয়ে কয়েকবার বলেছিলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! লোকটা তো মরার ভয়ে ঈমান আনার কথা বলছিল'। এতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'তুমি কি তার কলিজা চিরে চিরে দেখেছিল যে, সে মিথ্যে কথা বলছিল ? এই কথা বলে তিনি (সাঃ) বার বার বলতে থাকলেন, 'তুমি কেয়ামতের দিনে কি জবাব দিবে, যখন তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কে তোমার সামনে পেশ করা হবে! উসামা (রাঃ) বলেছেন, 'ঐ সময়ে আমার ইচ্ছা করছিল, হায় ! আমি যদি আজই ইসলাম গ্রহণ করতাম! আর এই অকাম করার জন্য আমার মাথাটা কাটা না যেত !' (মুসলিম)

পাপ ক্ষমা করার ব্যাপারে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। একবার কিছু লোক রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিবি হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহো আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ রটিয়েছিল, এবং অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে এমন একটা লোকও ছিল যাকে লালন পালন করে ছিলেন হযরত আবূবকর রাযি আল্লাহো আনহু। এই অপবাদ যখন সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন হযরত আবূবকর (রাঃ) রাগ করে ঐ লোকটির ভরণ-পোষণ বন্ধ করে দিলেন।কেননা, লোকটি তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যে বদনাম রটিয়েছিল। দুনিয়ার মানুষ এ ব্যাপারে এছাড়া আর কি সিদ্ধান্ত নিতে পারতো । অনেকে তো এ ধরনের লোককে মেরেই ফেলতো । হযরত আবু বকর (রা:)তো মাত্র এতটুকুই করেছিলেন যে , লোকটার ভরণ-পোষণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন । কিন্তু বিষয়টা যখন রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন , তখন তিনি হযরত আবু বকরকে (রা:) বুঝালেন, ঐ লোকটা তো ভুল করেছে এবং পাপ করেছে, কিন্তু আপনার মর্যাদা তো তার চাইতে বহু উঁচুতে । আপনার পক্ষে কি এটা সাজে যে , এক ব্যাক্তির পাপের কারণে আপনি তাকে তার রিয্‌ক থেকে বঞ্চিত করবেন? রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কথায় হযরত আবু বকর(রাঃ) পুনরায় লোকটির ভরণ-পোষণ করতে থাকলেন।

–(বুখারী,খ.২,কিতাবুত তফ্‌সীর)

সবর বা ধৈর্য

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন যে, মুমিনের জন্যে তো পৃথিবীতে শুধু ভালাঈ আর ভালাঈ, এবং মুমিন ছাড়া এই মর্যাদা আর কারো ভাগ্যেই জুটে না। সে যদি কোন সফলতা লাভ করে, তাহলে সে খোদাতা'লার কাছে শুকরিয়া জানায় এবং সে খোদাতা'লার পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়। আর যদি তার কোন দুঃখ-কষ্ট হয় তাহলে সে সবর করে ধৈর্য ধারণ করে। এবং এভাবেও সে খোদাতা'লার পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়। –(মুসলিম)

যখন আঁ হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হয়ে এলো, এবং তিনি অসুখের কষ্টের কারণে কোঁকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) একবার অস্থির হয়ে বললেন, 'আমি আমার বাপের কষ্ট আর দেখতে পারছি না।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর কথা শুনে বললেন, 'সবর করো। আজকের

দিনটার পরে আর তোমার বাপের কোন কষ্ট হবে না।' (বুখারী)। অর্থাৎ আমার কষ্ট তো এই দুনিয়ার জিন্দেগী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, আজ আমি আমার প্রভুর কাছে চলে যাব। এরপর, আমার জন্য কষ্টের কোন মুহূর্ত আর আসবে না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, এবং তা হচ্ছে তিনি (আঁ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কলেরা ইত্যাদি মহানবীর সময় এক শহর থেকে অন্য শহরে যাওয়াটা পসন্দ করতেন না। কেননা, এতে করে এক এলাকার ব্যাধি অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তিনি (সাঃ) বলতেন, 'যদি এই ধরনের ব্যাধির এলাকায় কোন ব্যক্তি, ধৈর্যের সঙ্গে থেকে যায় এবং অন্য এলাকায় মড়ক ছড়ানোর কারণ না হয়, আর যদি সে মারা যায়, তাহলে সে শহীদ হবে।' (বুখারী)।

পরস্পর সহযোগিতা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হামেশাই তাঁর সাহাবাদেরকে এই নসীহত করতেন যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে কাজ করবে। এবং তিনি জামাতের লোকদের জন্য এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন অপরাধ করে বসে যার জন্য তাকে বদলা দিতে হবে অর্থাৎ বিনিময়ে পণ দিতে হবে ; আর সেই পণের টাকা দিতে যদি সে সমর্থ না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার মহল্লাবাসী বা তার শহরবাসী বা তার জাতি তার পক্ষে ঐ পণের টাকা পরিশোধ করবে।

অনেক লোক যারা ধর্মের খেদমতের জন্য তাঁর (সাঃ) কাছে আসা-যাওয়া করতো, তিনি তাদের আত্মীয়-স্বজনকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন ওদের দায়িত্ব বহন করে এবং ওদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের যামানায় একবার দুই ভাই একসাথে মুসলমান হলো, এক ভাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছেই থেকে গেল, এবং অপর ভাই তার নিজের কাজে-কর্মে ফিরে গেল। কাজ-কর্ম করা ভাইটি একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করলো যে, এ নাকম্মা বসেই থাকে কোন কাজই করে না। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'এমন কথা বলতে নেই, খোদাতা'লা ওরই উছিলায় তোমাকেও রিয্ক (খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি) দিচ্ছেন। কাজেই ওর খেদমত করবে এবং ধর্মের সেবায় ছেড়ে দাও।'(তিরমিযী)

একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সফরে যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক মন্যিল পথ যাওয়ার পর তাঁবু গাড়লেন। এবং সাহাবারাও (রাঃ) ময়দানে ছড়িয়ে পড়লেন যাতে করে শিবির স্থাপন করা যায় এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র জোগাড় করা যায়। তাঁরা (রাঃ) নিজেরা পরস্পরের মধ্যে কাজ ভাগ করে নিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভাগে কোন কাজ রাখলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তো আমার জিম্মায় কোন কাজ রাখলে না। আমি লাক্ড়ি সংগ্রহ করে আনবো যাতে করে রান্না-বান্নার কাজ করা যায়। সাহাবারা (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরাই তো আছি কাজের জন্য আপনার আবার কাজ করার দরকার কি ? তিনি (সাঃ) বললেন, 'না, না, এটা আমার কর্তব্য যে, আমিও কাজে অংশ গ্রহণ করি। বস্তুতঃ তিনি (সাঃ) জংগল থেকে খড়ি সংগ্রহ করে আনলেন যাতে সাহাবারা খাদ্য-দ্রব্য রান্নার কাজ করতে পারে।' (যুরকানী, খ. ৪)

সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোকাম বা অবস্থান ও মর্যাদা এত উচুতে ছিল যে, তাঁর জাতি বা গোত্রই তাঁর নাম রেখেছিল 'সিদ্দীক' – সত্যবাদী। তিনি (সাঃ) তাঁর জামাতকেও সর্বদাই সত্যবাদিতার উপরে কায়েম থাকার জন্য উপদেশ দিতেন, নির্দেশ দিতেন। এবং তাদেরকে সত্যবাদিতার এত উচ্চ স্থানে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যা কিনা সর্ব প্রকারে মিথ্যার লেশ থেকেও পবিত্র ছিল। তিনি (সাঃ) বলতেন যে, সত্যবাদিতাই পুণ্যকর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। এবং পুণ্যকর্মের ফলেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। এবং সত্যবাদিতার আসল মোকাম বা প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, মানুষ সর্বদাই সত্য বলবে, যাতে করে সে খোদাতা'লার কাছে সত্যবাদী বলে গৃহীত হয়। (তিরমিযী)

একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি বন্দী হয়ে এলো। সে বহু মুসলমানকে হত্যা করেছিল। হযরত ওমর (রাঃ) মনে করেছিলেন যে, এই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডের যোগ্য। তিনি বার বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে তাকাচ্ছিলেন, যেন ইশারা পাতা মাত্রই লোকটাকে হত্যা করতে পারেন। লোকটা যখন উঠে চলে গেল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! এই লোকটা তো হত্যাযোগ্য ছিল। আঁ হুযূর (সাঃ) বললেন, হত্যাযোগ্য ছিল তো, তুমি তাকে হত্যা করলেন না কেন ? তিনি (রাঃ) বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনি যদি একটু শুধু চক্ষের ইশারা করতেন, আমি ওকে কতল করতাম। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'নবী তো ধোঁকাবাজ হয় না। এটা কী করে হতে পারে যে, আমি মুখে তার সঙ্গে স্নেহ-মমতার কথা বলবো আর চোখে তাকে হত্যা করার ইশারা করবো।' (ইবনে হিশাম)

একবার এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে এলো, এবং সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার মধ্যে তিনটি দোষ আছে ঃ (১) মিথ্যা (২) মদ্যপান এবং (৩) যিনা (ব্যভিচার)। আমি বহু চেষ্টা-চরিত্র করেছি যাতে এই দোষগুলো থেকে কোন রকমে বাঁচতে পারি। কিন্তু, আমার চেষ্টা-চরিত্রে কোন ফল হয়নি। আপনি একটা কিছু উপায় বলে দিন।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি আমার কাছে একটা পাপ ছাড়ার অঙ্গীকার কর, দ্বিতীয়টা আমি ছাড়িয়ে দেব।' সে বললো, আমি অঙ্গীকার করছি, আপনি বলুন কোন পাপটা ছাড়বো।' আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'মিথ্যা ছেড়ে দাও।' কিছুদিন পরে লোকটা আবার এলো এবং বললো, 'আপনার হুকুম মত আমি চলেছি, এবং সমস্ত পাপই এখন দূর হয়ে গেছে।' আঁ হযরত (রাঃ) বললেন, 'বলো কী করে হলো।' সে বললো, 'আমার মনে একদিন মদ খাওয়ার ইচ্ছে জাগলো। আমি মদ খাওয়ার জন্য উঠলাম। আমার মনে হলো এর আগে আমার বন্ধু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতো কি, তুমি কি মদ খেয়েছ না কি ? আমি তখন মিথ্যা কথা বলতাম, বলতাম যে, না, খাইনি। কিন্তু, এখন তো আমি সত্য বলবার ওয়াদা করেছি। এখন যদি আমি বলি যে, হ্যাঁ আমি মদ খেয়েছি, তাহলে সে আমার উপরে চটে যাবে। আর যদি বলি যে, না, খাইনি, তাহলে, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হবে। অথচ, মিথ্যা না বলার জন্যই আমি ওয়াদা করেছি।' কাজেই আমি মনে মনে ভাবলাম, এখন থাক, পরে খাব। একইভাবে, আমার মনে ব্যভিচারের ইচ্ছা জাগলো। এবং এক্ষেত্রেও আমার

মনে একই কথার উদয় হলো যে, যদি আমার বন্ধু আমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে আমি তাকে কি বলবো ? যদি বলি যে, হ্যাঁ আমি ব্যভিচার করেছি, তাহলে তো আমার বন্ধু রেগে যাবে। আর যদি বলি, না, করি নি। তাহলে, মিথ্যা বলা হবে। আর মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। এইভাবে, আমার এবং আমার মনের মধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক চলতেই থাকলো। অবশেষে, কিছুদিন পর্যন্ত এই দুটো দোষ থেকে দূরে থাকার কারণে আমার মন থেকে এগুলের আকর্ষণ তিরোহিত হয়ে গেল। এবং সত্যবাদিতা মেনে চলার দরুন অন্য সব দোষ থেকেও আমি বেঁচে গেলাম।'

গোয়েন্দাগিরি না করা এবং সুধারণা পোষণ করা

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করেছেন। এবং একে অপরের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে আদেশ দিয়েছেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) বলতেন যে, কুধারণা পোষণ করা থেকে দুরে থাকবে। কেননা, কুধারণা সব থেকে বড় মিথ্যা। এবং গোয়েন্দাগিরি বা ছিদ্রান্বেষণ করবে না। লোকদের ঘৃণাসূচক কোন নাম রাখবে না। এবং হিংসা করবে না। এবং কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করবে না। সবাইকে নিজেদের খোদারই বান্দা মনে করবে। নিজেরা পরস্পর পরস্পরকে ভাই মনে করবে। এটাই খোদাতা'লার হুকুম।

তিনি (সাঃ) আরও বলতেন যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। না একজন একজনের উপরে যুলুম করবে, না দুঃখ-কষ্টের সময়ে একজন একজনকে পরিত্যাগ করবে। না সম্পদ ও শিক্ষা বা অন্য কিছু কম থাকার কারণে কেউ কাউকে হেয় মনে করবে। তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা) মানুষের হৃদয়ে পয়দা হয়। এবং মানুষকে ঘৃণিত করে ফেলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার ভাইবে হেয় মনে করবে।

'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তার প্রত্যেক মুসলিম ভাইয়ের রক্ত তার ইজ্জত, এবং তার সম্পদের উপর হামলা চালানো হারাম।'

'আল্লাহতা'লা না তোমাদের দেহগুলিকে দেখেন, না চেহারা সুরত দেখেন, না তিনি তোমাদের কাজকর্মের বাহ্যিক অবস্থা দেখেন ; বরং তিনি তোমাদের হৃদয়গুলিকে দেখে থাকেন।' (মুসলিম)

ধোঁকাবাজি ও ফেরেববাজির প্রতি ঘৃণা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন যে, মুসলমানদের মধ্যে যেন ধোঁকাবাজি ও ফেরেববাজি বা প্রতারণার লেশ মাত্র অবশিষ্ট না থাকে। একবার তিনি (সাঃ) বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, খাদ্য-শস্যের একটা ঢিপি লাগানো হয়েছে এবং সেগুলো নিলামে বিক্রী করা হচ্ছে। তিনি শস্যের ঢিপিতে হাত দিয়ে দেখতে পেলেন যে, বাইরের শস্য তো শুকনোই, কিন্তু ভেতরে ভেজা শস্য রয়েছে। তিনি তাঁর হাত বের করে নিয়ে শস্যওয়ালাকে বললেন, 'এটা কী ধরনের কথা ?' সে বললো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ ! বৃষ্টির ছিটে লেগেছিল। যার দরুন শস্যগুলো কিছুটা ভিজে গেছে'। আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু তুমি, ভেজা অংশটা বাইরে রাখনি কেন ? রাখলে তো লোকেরা তা দেখে শুনে নিতে পারতো।

তিনি আরও বললেন, 'যে ব্যক্তি অন্যদরকে ধোঁকা দেয়, সে জামাতের (সমাজের) উপকারী সদস্য হতে পারে না।' (তিরমিযী)

তিনি খুব জোরের সঙ্গে বলতেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কখনই কোন ধোঁকা বা প্রতারণা থাকা উচিত নয়। না দেখে শুনে কোন জিনিষ নেওয়া ঠিক নয়। সুদের উপরে সুদ গ্রহণ করা উচিত নয়। দ্রব্য-সামগ্রী এজন্য আটকে (গুদামজাত করে) রাখা উচিত নয় যে, বাড়লে সেগুলো বিক্রী করা হবে। বরং, যার প্রয়োজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ পত্র দিয়ে দিতে হবে।

নৈরাশ্যবাদিতার বিরোধিতা

আঁ হযরত (সাঃ) নৈরাশ্যবাদিতার চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, যে ব্যক্তি জনগণের মধ্যে নৈরাশ্যবাদী কথা-বার্তা ছাড়ায়, সে জাতির ধ্বংসের জন্য দায়ী, কেননা, এই ধরনের কথা প্রচারিত হলে জাতির হিম্মত নষ্ট হয়ে যায় এবং জাতি অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। একইভাবে, তিনি গর্ব ও অহংকার করতেও নিষেধ করতেন, কেননা, এগুলিও, বস্তুতঃ একটা জাতিকে অধঃপতনের দিকে ধাবিত করে। তার হুকুম ছিল যে, এই উভয়ের অন্তবর্তী যে মধ্যমপন্থা, তা-ই অবলম্বন করা উচিত। মানুষ, না গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন করবে, না নৈরাশ্য বা হতাশার পথ বেছে নিবে। বরং, সে কাজ করবে এবং ফলাফলের প্রত্যাশা খোদার উপরেই ছেড়ে দিবে। নিজের জামাত বা সম্প্রদায়ের উন্নতির আকাংখা তো মনের মধ্যে থাকবে, কিন্তু সেজন্য কোন অহংকার বা গর্ব থাকবে না।

প্রাণীদের প্রতি উত্তম আচরণ

রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রাণীদের উপরে নির্যাতন করা অত্যন্ত অপসন্দ করতেন। তিনি বলতেন যে, বনী ইসরাঈলের একজন স্ত্রীলোক এজন্যই খোদার গযবে পড়েছিল যে, সে তার বিড়ালকে না খাইয়ে মেরেছিল। একইভাবে তিনি একথাও বলতেন যে, পূর্ববর্তী এক উম্মতের এক ব্যক্তি এজন্যই ক্ষমা পেয়েছিল যে, সে একটি পিপাসার্ত কুকুরকে একটি কুয়ার পার্শ্বে ঘুরতে দেখেছিল। কিন্তু কূয়া থেকে পানি তুলে পিপাসা নিবারণ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লোকটি নিজের পায়ের বুট জুতো খুলে তা রশির সঙ্গে লটকিয়ে সেই জুতোর মধ্যে করে পানি তুলে কুকুরটি পান করিয়েছিল। এই সৎ কাজের জন্য খোদাতা'লা তার সকল অতীত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। (বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, 'একসময় আমরা তাঁর (সাঃ) সঙ্গে সফরে ছিলাম। আমরা দু'টি ঘুঘুর বাচ্চা দেখতে পেলাম। বাচ্চা দু'টি ছিল ছোট। আমরা বাচ্চা দু'টি ধরলাম। ঘুঘুটি যখন ফিরে এলো, তখন সে ভয়ে আমাদের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকলো। এমন সময় রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে এলেন এবং বললেন, 'এই প্রাণীটিকে ওর বাচ্চার জন্য কে কষ্ট দিয়েছে ? এক্ষুণি বাচ্চা দু'টিকে ছেড়ে দাও, যাতে ওর মন শান্ত হয়।' (আবূ দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) আরও বলেছেন, একবার আমরা একটা পিঁপড়ার গর্ত দেখতে পেয়ে সেটার মধ্যে খড়, পাতা ইত্যাদি দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলাম। এটা

জানতে পেরে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'এটা তোমরা কেন করেছ ! এটা করাতো তোমাদের উচিত হয়নি।' – (আবূ দাউদ)

একবার আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম দেখতে পেলেন যে, একটি গাধার মুখের উপরে দাগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে দাগ লাগাচ্ছ কেন ? লোকেরা বললো, রোমানরা উন্নত জাতের গাধাগুলোকে চিনতে সুবিধার জন্য এই রকম দাগ দিত। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, 'এটা করবে না। মুখ হচ্ছে শরীরের নাজুক অংশ। দাগ যদি একান্তই দিতে হয় তো পশুর পিঠে দাগ দিও।' (আবূ দাউদ)

বস্তুতঃ, তখন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে পশুর পিঠে দাগ দেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়। আর এখন মুসলমানদের দেখা দেখি ইউরোপের পশুর পিঠেই দাগ দেওয়া হয়।

অন্যের কাজ বক্রদৃষ্টিতে না দেখা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সব সময়ে এই উপদেশ দিতেন যে, খামাখা কেউ অন্যের কাজের উপরে আপত্তি উত্থাপন করবে না। এবং তোমার সঙ্গে যে বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই তার মধ্যে নাক গলাবে না। কেননা, এতে করে ফেৎনা কলহের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি বলতেন যে, মানুষের জন্য ইসলামের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে বিষয়ে তার সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই তার মধ্যে সে যেন অহেতুক হস্তক্ষেপ না করে। তাঁর (সাঃ) প্রদর্শিত এই চারিত্রিক গুণটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটিকে যথাযথভাবে অনুসরণ করলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। হাজার হাজার খারাপী পৃথিবীতে এই কারণেই সৃষ্টি হয় যে, মানুষ তো দুর্দশাগ্রস্ত, মানুষকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, কিন্তু খামাখাই মানুষের কাজে আপত্তি তুলতে বা নাক গলাতে এগিয়ে আসে।

ধর্মীয় সহনশীলতা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ধর্মীয় সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতার উপরে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দান করতেন। এবং এক্ষেত্রে স্বয়ং তিনি সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

ইয়ামেন-এর খৃষ্টান কাবিলা নাজরানের একটি প্রতিনিধি দল ধর্মীয় বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে এসেছিল। ঐ প্রতিনিধি দলে বড় বড় পাদ্রীরাও ছিলেন। মসজিদের মধ্যে বসে আলোচনা শুরু হয় এবং আলোচনা অনেক লম্বা হয়। তখন, ঐ কাফেলার পাদ্রী বললেন, 'এখন আমাদের প্রার্থনার সময় আমরা বাইরে গিয়ে প্রার্থনা সেরে আসি।' রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'বাইরে যাওয়ার কি দরকার, আমাদের মসজিদের মধ্যে আপনারা আপনাদের এবাদত করতে পারেন। আসলে, আমাদের মসজিদ তো খোদার এবাদতের জন্যই বানানো হয়েছে।' –(যুরকানী)

সাহসিকতা

আঁ হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহসিকতার কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর জীবনী (নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম) গ্রন্থে। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। যখন মদীনায় এই খবর প্রচারিত হওয়া শুরু হয়ে গেল যে, রোমান সম্রাট এক বিশাল সেনাবাহিনী পাঠাচ্ছেন মদীনা আক্রমণ করার জন্য। তখন মুসলমানরা রাত্রিবেলায় বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করলো এবং সজাগ অবস্থায় রাত কাটাতে থাকলো। এক রাত্রে মদীনার বাইরের মরুভূমি থেকে উচ্চ কোলাহলের আওয়াজ ভেসে আসলো। সাহাবারা (রাঃ) তাড়াতাড়ি করে তাঁদের ঘর থেকে বাইরে এলেন, 'কেউ কেউ এদিক ওদিক দেখার জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। আর কেউ কেউ মসজিদ এসে সমবেত হতে থাকলেন। তাঁরা এই প্রতীক্ষায় বসে থাকলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাইরে এলে তাঁর নির্দেশ মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে, এবং যদি কোন বিপদ এসেই পড়ে তো তা দূর করা যাবে। তাঁরা তো সবাই বসে ছিলেন এই প্রতীক্ষায় যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, কিন্তু তাঁরা দেখতে পেল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম একা ঘোড়ায় চড়ে বাইরে থেকে আসছেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, কোলাহলের প্রথম আওয়াজ কানে আসা মাত্রই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির মধ্যে চলে গিয়েছিলেন একটা দেখতে যে, কোন বিপদ তো এসে পড়েনি ! তিনি এ ব্যাপারে কোনই প্রতীক্ষা করেননি যে, সাহাবারা জমা হয়ে যাক তো একসঙ্গে বাইরে গিয়ে দেখা যাবে যে, কি হয়েছে। বরং, তিনি একাই বাইরে চলে গেলেন এবং প্রকৃত অবস্থা জেনে ফিরে এলেন এবং সাহাবাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন বিপদের কিছু নেই, তোমরা নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে আরাম করো, শুয়ে ঘুমাও গিয়ে, যাও।' (বুখারী, বাবুশ্ শুজায়াত)

স্বল্প-বুদ্ধি বা অসংস্কৃতিবান লোকদের প্রতি স্নেহ ও মমতা

স্বল্প-বুদ্ধির (অসংস্কৃতিবান) লোকদের প্রতি আঁ হযরত (সাঃ) অত্যন্ত নরম ও স্নেহভরা আচরণ করতেন। একবার এক যাযাবর সদ্য ইসলাম গ্রহণ করার পর মসজিদের মধ্যে বসা ছিল। কিছুক্ষণ পর তার পেশাব লাগলো। সে উঠে গিয়ে মসজিদের মধ্যেই এক কোণায় বসে প্রস্রাব করতে লাগলো। সাহাবারা (রাঃ) তাকে নিষেধ করতে লাগলো। তখন, আঁ হুযূর সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে (রাঃ) বললেন, 'ওকে বাধা দিও না, নইলে ওর অসুবিধা হতে পারে। অসুখ হয়ে যেতে পারে। ওর পেশাব করা শেষ হয়ে গেলে জায়গাটা পানি দিয়ে ধুয়ে দিও।' (বুখারী)

চুক্তি রক্ষা

চুক্তি রক্ষা করার ব্যাপারে আঁ হযরত (সাঃ) এত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, একবার একটি রাষ্ট্রের একজন দূত তাঁর কাছে এক পয়গাম নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাঁর (সাঃ) সঙ্গে কয়েকদিন কাটাবার পর ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারলেন। এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন,' ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি আমার হৃদয় থেকে মুসলমান হয়ে গেছি, এখন আমি ইসলাম গ্রহণের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে চাই।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা ঠিক হবে না। তুমি তোমার রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এক বিশেষ চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত হয়ে এসেছ। তোমার সেই অবস্থা অক্ষুণ্ন রেখেই তুমি ফিরে যাও। ফিরে যাওয়ার পরে যদি তোমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালবাসা কায়েম থাকে, তাহলে আবার এসে তুমি ইসলাম গ্রহণ করিও।' (আবূ দাউদ, বাব ঃ ওফা বিল আহদ)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের চরিত্রের বিষয়-বস্তু এমন কোন বিষয়-বস্তু নয়, যা কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই বর্ণনা করে শেষ করা যায়। কিংবা মাত্র কয়েকটি দিকের আলোচনা করেই সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা করা যায়। এবং যেহেতু এই আলোচনা তাঁর (সাঃ) চরিত্রের উপরে লিখিত কোন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয় এবং যেহেতু এই ভূমিকার মধ্যে সেরূপ দীর্ঘ রচনারও কোন অবকাশ নেই, সেহেতু এতটুকুর মধ্যেই শেষ করতে হচ্ছে।

---

* এই রচনাটি মহামান্য গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত – 'তফ্সীর কবীর' – নামক কোরআন করীমের সুবিশাল তফসীর গ্রন্থের ভূমিকার একটি অংশ মাত্র। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার ভূমিকাতে কোরআন করীম সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে হযরত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনীও সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তা সঙ্গত কারণেই বেশী বিস্তারিত নয়। ভূমিকার এই জীবনী অংশটি আমরা ইতোপূর্বে প্রকাশ করেছি 'নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম' শিরোনামে।

আলহামদু লিল্লাহ।

ঃ সমাপ্ত ঃ